স্বাধীনতা সংগ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান : একটি সমীক্ষা

উৎস বড়ুয়া জয়

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং ঐ বছর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম ছিল বহুবিদ ঘটনা, বিরূপ পরিস্থিতি, অসম আর্থিক ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বঞ্চনাসহ গুরুতর বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যেসব ইস্যুতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তার মধ্যে ছিল ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্রভাষা, অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্য দশ দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে আলাদা। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনমানুষ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেননি সত্য, কিন্তু কেউ বসে থাকেননি। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউবা কলম হাতে, কেউবা মেধা মননশীলতা খাটিয়ে, কেউবা গানে গানে, কেউ শিল্পীর তুলির আঁচড়ে বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতিসত্তা হিসেবে বৌদ্ধরা অতি প্রাচীন। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বির্নিমাণে বৌদ্ধদের অসামান্য অবদান রয়েছে। এদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে বৌদ্ধদের গৌরবময় অবদান লক্ষ্য করা যায়। মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশে-বিদেশে নানাভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই তিনি ২০১০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক, ২০১১ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেছিলেন। স্বাধীনতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাঁকে এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত অহিংসার পথে থেকেও যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সংসার ত্যাগী মহান ব্যক্তি পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের। বাঙালি বীরের জাতি। শৌর্য বীর্য ও মহিমান্বিত জাতি। দেশ প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা হল সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় তথা নানা বর্ণ-গোত্র-জনমানুষের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। স্বাধীনতা বা মুক্তি হল প্রকৃত দেশপ্রেমের অমূল্য আকর। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের উদ্যেগে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরুদের অবদান শ্রদ্ধার সংঙ্গে স্মরণ করে তিনি বলেন, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রয়াত সভাপতি মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ও পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের, এদের মধ্যে একজন স্বদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন, অন্যজন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের প্রতিনিধি হয়ে, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে আরো যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখেন পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, মহামান্য সংঘরাজ ভদন্ত অভয়তিষ্য মহাথের, পরম সাধক ভদন্ত ধর্মবিহারী স্থবির, ড. বুদ্ধদত্ত মহাস্থবির, সংঘনায়ক পণ্ডিত আনন্দমিত্র মহাস্থবির, ভদন্ত জিনানন্দ ভিক্ষু, ভদন্ত প্রিয়ানন্দ মহাথের, সংঘনায়ক এস ধর্মপাল মহাথের, সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের, অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের, ভদন্ত সংঘরক্ষিত মহাথের, ড. শাসনরক্ষিত মহাথের, ভদন্ত শান্তপদ মহাথের, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভদন্ত অমৃতানন্দ ভিক্ষু, ভদন্ত সুগতানন্দ মহাথের, ভদন্ত শাক্যবোধি মহাথের, অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, ভদন্ত অগ্রবংশ মহাথের, ভদন্ত বোধিপাল ভিক্ষু, ভদন্ত শরণাঙ্কর ভিক্ষু, ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের, ভদন্ত আর্যমিত্র মহাথের, ভদন্ত বিজয়ানন্দ মহাথের, মহামুনি পাহাড়তলীর ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথের, পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের, উ পাণ্ডিতা মহাথের, উ জিনিতা মহাথের, উ নাইন্দা মহাথের, ভদন্ত বসুমিত্র মহাথের, ভদন্ত সোমানন্দ ভিক্ষু, ভদন্ত অগ্রশ্রী মহাথের, ভদন্ত ধর্মবিরিয় মহাথের, ভদন্ত বঙ্গীশ ভিক্ষু প্রমুখ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁদের অবদান জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। নিম্নে কয়েকজন সংঘ মনীষার স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের কথা তুলে ধরা হলো। আশা করি "স্বাধীনতা সংগ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান : একটি সমীক্ষা" এর উপর কিছুটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনসহ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান তুলে ধরতে স্বক্ষম হবো।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান : একটি মূল্যায়ন

১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার পক্ষে অংশগ্রহণ আমাদের জাতিকে গর্বিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিদের জন্য স্মরণীয় এবং ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত একটা অধ্যায়। লাখো শহীদের আত্মত্যাগ ও লাখো মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হয় সবুজের মাঝে রক্ত সূর্যখচিত একটি পতাকা, একটি স্বাধীন

সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ।[১] তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব, আমাদের প্রেরণার উৎস। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছেন। যাদের জন্য আমরা গর্বিত এবং অনুপ্রাণিত। প্রয়াত মহাসংঘানায়ক সমাজ সংস্কারক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এবং সংঘরাজ পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের, শহীদ জিনানন্দ ভিক্ষুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বাঙালি বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ প্রধানত দুইভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রথমত: দেশের অভ্যন্তরে বৌদ্ধদের জান মাল রক্ষায় প্রয়াত মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ মিশনারী কাজ, দ্বিতীয়ত: মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন লাভে সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাথের বহির্বিশ্বের বৌদ্ধদেশ সমূহ পরিভ্রমণ। উল্লেখ যে, এই দুই মহান সাংঘিক ব্যক্তিত্ব কৃতকর্মের স্বীকৃতি স্বরুপ পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের মহান একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক এবং মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের মহান একুশে পদক লাভ করেন। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ভিক্ষু সুনীথানন্দ রচিত "বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন"[২] গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রয়াত মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মাধ্যমে বৌদ্ধ পরিচয় পত্র দিয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন। অনেক হিন্দু, মুসলমানকে প্রাণে রক্ষা করেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মানব সেবা, ধর্মপ্রচার, শিক্ষাব্রতী এবং দেশ মাতৃকার জন্য নিবেদিত প্রাণ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের এক অবিসংবাদিত নাম

ব্রিটিশ শাসনামলে তদানীন্তন ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন কেমতলী গ্রামে ১৯১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন দ্বারিকা মোহন সিংহ নামে এক শিশু। এই অঞ্চলের পারিবারিক উপাধি হল 'সিংহ'। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় বলা হয়, দুই হাজার ৫৫৬০ বছর আগে জন্ম নেওয়া শাক্যবংশীয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থের (পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধ) পারিবারিক নাম 'শাক্যসিংহ' থেকে এই অঞ্চলের বৌদ্ধরা 'সিংহ' উপাধি ধারন করেন। ১৯৩৩ সালে ১৯ বছর বয়সে তিনি আগারিক জীবন থেকে অনাগারিক জীবনে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় জ্যোতিঃপাল শ্রামণ। পরে তিনি ১৯৩৮ সালে ১৪ জুলাই শুভ উপসম্পদা লাভ করে জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু নাম ধারন করেন। বৌদ্ধ ধর্মে তিনি সুত্ত, বিনয় ও উপাধি ডিগ্রী নিয়েছিলেন।[৩]

তিনি ভারতের নালন্দা বিদ্যাভবন থেকে ত্রিপিটক বিশারদ উপাধি এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা সংস্কৃত ও পালি বোর্ড আয়োজিত অভিধর্ম উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি আনুষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষা না করলেও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণী পযর্ন্ত পৌঁছান। দৃঢ়চেতা সার্বজনীন কল্যাণে উৎসর্গীত এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর বর্ণাঢ্য জীবন কৃতিত্ব ও অর্জনে ভরপুর। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পযর্ন্ত বাংলাদেশি বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বৃহত্তর সাংঘিক সংগঠন সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার দশম সংঘরাজ ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়ার পাশাপাশি তাঁর আরো অনেক পরিচয় আছে। তিনি একাধারে একজন সাহিত্যিক, সংগঠক, শিক্ষানুরাগী, সমাজকর্মী, গবেষক, লেখক, কর্মবীর, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব সমাজ, সংস্কারক এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। কুমিল্লার অনগ্রসর পশ্চাদপদ মানুষের জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। কুমিল্লার বিভিন্ন গ্রামে সাতটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৪২ সালে লাকসামে একটি অনাথালয় স্থাপন করেন। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে গরীব ছাত্র ও অনাথদের শিক্ষা ও বাসস্থানের জন্য তিনি এই অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৪৬ সাল থেকে লাকসাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর একান্ত সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত লাকসাম থানাধীন হরিশ্চর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে প্রায় ৩৩ বছর ধরে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে বরইগাঁও পালি কলেজ, ১৯৪৮ সালে মৌমাছি পালন ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৪৯ সালে কৃষকদের সমবায় সমিতি, বস্ত্র নির্মাণ, উল তৈরি ও ছাত্রদের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বশান্তি প্যাগোডা ও গোবিন্দ-গুণালংকার বৌদ্ধ ছাত্রাবাস, ১৯৯১ সালে নারী শিক্ষা বিস্তারে কুমিল্লার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৯৯১ সালে বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬৮ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কুমিল্লার শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই কুমিল্লা অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধদের কাছে নন্দিত ধর্মগুরু, মুসলমানদের কাছে মানবতাবাদী পীরতুল্য ব্যক্তিত্ব এবং হিন্দুদের কাছে পবিত্র গুরু হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেবা-মানবতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য রচনায়ও অসামান্য অবদান রাখেন। কর্মতত্ত্ব, উপ-সংঘরাজ গুণালংকার মহাস্থবিরের আত্মজীবনী, পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, বোধিচর্যাবতার, সাধনার অন্তরায়, প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ, ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্তান-পতন, ব্রহ্মবিহার, চর্যাপদ, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, সৌম্য সাম্যই শান্তির কারণ, ভক্তি শতকম, বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও পঞ্চবুদ্ধ, মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং পালি বাংলা অভিধান সম্পাদনা তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।[৪]

বহুমুখী প্রতিভাবান কীর্তিমান জ্যোতিঃপাল মহাথের জীবনে অনেক সম্মাননা পেয়েছিলেন। তাঁর কর্ম প্রতিভা এক সময় দেশের মাটিকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি হয়ে উঠেন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। ১৯৯৫ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংগঠন জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি মানবতা ও নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদানের জন্য তাঁকে 'বিশ্ব নাগরিক' উপাধি প্রধান করেন। এই দুর্লভ উপাধি প্রাপ্তিতে তিনি হয়ে গেলেন বিশ্বজনীন ধর্মগুরু। এই উপাধি দ্বারা তিনি নিজে একা গর্বিত হননি, গর্বিত হয়েছেন পুরো বাঙালি জাতি ও দেশবাসী। ১৯৭৫ সালে তিনি এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত হিতোসি বার্ষিকী ও মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরে অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা মঙ্গোলিয়া হতে ১৯৭৮ সালে তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।

তাঁর গৌরবোজ্জ্বল সাংঘিক জীবনের এক অসাধারণ হল নিখুঁত দেশপ্রেম। পাক বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে যাতে বিশ্ববাসী সহজে জানতে না পারে তৎজন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সকল বিদেশি সাংবাদিককে পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ কেউ আত্মগোপনে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা পাকিস্তানি বর্বরতার সংবাদ সচিত্র তুলে ধরে বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছিলেন। তবে বিশ্ব জনমত গঠনে জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর অনন্য অসাধারণ ভূমিকা ছিল।এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আগরতলার বাংলাদেশ মিশনের পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ জহুর আহমেদ চৌধুরী, মাহবুব আলম চাষী, সৈয়দ আলী আহসান, এইচ টি ইমাম, আকবর আলী খান প্রমুখের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। তাঁদের সাথে আলোচনার পর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব বৌদ্ধদের তথা বিশ্ববাসীর মধ্যে জনমত গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, পাক সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতন বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি অপরিহার্য। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী সহযোগীদের পরার্মশ নিয়ে বাংলাদেশে পাক-বাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ সম্বলিত প্রচারপত্র তৈরি করেন। জাতিসংঘের তদানীন্তন মহাসচিব মি. থান্ট এবং শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকসহ পৃথিবীর সকল দেশের বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের আঞ্চলিক শাখা ও বৌদ্ধ সমিতিগুলোর কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যা ও নির্যাতন বন্ধে চাপ সৃষ্টির আবেদন করেন। এদিকে মুজিব সরকার এবং ভারত এশীয় বৌদ্ধ দেশগুলোতে প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত পূর্বাঞ্চলীক মিশনের অন্যতম কর্মকর্তা এইচ টি ইমাম সাহেবকে টেলিগ্রামে জানানো হয়।[৫]

টেলিগ্রামে জ্যোতিঃপাল মহাথের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানরাজা মংপ্রু সেইন চৌধুরীকে মুজিব নগরে পাঠানোর কথা বলা হয়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে জ্যোতিঃপাল মহাথের মুজিব নগরে উপনীত হন। সেখানে হাইকমিশনার আলী হোসেন, আবদুল করিম চৌধুরী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী প্রমুখ তাঁকে বিদেশ গমনের উদ্দেশ্য এবং করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা দিলেন। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি আগরতলা থেকে কলকাতা এবং পরে নয়াদিল্লী গিয়েছিলেন।

নয়াদিল্লিতে জগৎজ্যোতি বিহারের অধ্যক্ষ ভারতীয় রাজ্যসভার সদস্য ধর্মবীরিয় মহাথেরোর সহায়তায় ভারতের বৌদ্ধ নেতা এবং সংসদ সদস্যদের সাথে দেখা করেন। ২৯ জুলাই তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করে বাঙ্গালী জনগণ এবং বৌদ্ধদের উপর চলমান বর্বরতার বর্ণনা দেন। ৭ই আগস্ট অ্যাডভোকেট ফকির সাহাবুদ্দিন সাহেবসহ তিনি শ্রীলংকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। উল্লেখ্য, যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের স্থলপথ ও আকাশপথ এক প্রকার বিচ্ছিন্ন ছিল। শুধু কলম্বো বিমানবন্দর হয়ে বাংলাদেশে উড়োজাহাজ চলাচলের সুবিধা ছিল। তাঁরা শ্রীলংকাকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, পাকিস্তানি উড়োজাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশে সৈন্য (৫০০) করে এবং অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য শ্রীলংকার আকাশপথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য পাঁচ মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের কাছে পেশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন থেকে পাকিস্তানি বিমানের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে করে পাকিস্তানের যুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি সেনাদের রসদ, গোলাবারুদ ও অস্ত্র সম্পূর্ণরুপে বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর তিনি এবং শাহাবউদ্দিন সাহেব ১১ আগষ্ট থাইল্যাণ্ড, ১৬ আগস্ট জাপানে একই কাজ করেন। পরে ২২ আগস্ট জ্যোতিঃপাল মহাথের হংকং হয়ে নয়াদিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন এবং শাহাবউদ্দিন সাহেব হংকং থেকে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর পরিভ্রমণ করে দিল্লি ফিরে আসেন। ১৮ ও ২০ সেপ্টেম্বর নয়াদিলিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত প্রতিনিদি হিসেবে জ্যোতিঃপাল মহাথের অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক ও সৈয়ত আলী আহসান ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। সম্মেলনে ৩১ টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। এ সম্মেলনে যোগদানকারী বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের

জ্যোতিঃপাল মহাথের দিল্লির জগৎজ্যোতি বিহারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি এ দেশের মানুষের উপর পাক-বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণ বিশদভাবে তুলে ধরেন। জ্যোতিঃপাল মহাথের সম্পর্কে কুমিল্লার প্রাক্তন সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার লিখেছেন, আমি জানি যে, "একমাত্র জ্যোতিঃপাল মহাথের ব্যতীত বাংলাদেশের অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের উর্দ্ধতন ধর্ম-যাজক বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে সহযোগিতা করেননি"। কিন্তু তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমি উদ্ধার কল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কুমিল্লা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার মোঃ জহিরুল ইসলাম বলেছেন, বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে উচ্চ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সংগঠক রূপে সহযোগিতা করেছেন কুমিল্লা নিবাসী মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের।

পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠনে পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছিলেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। অবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি নিজ সাধনপীঠ কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় উপনীত হন। সেখানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান সাংবাদিক দেবপ্রিয় বড়ুয়ার (ডি.পি বড়ুয়া) ধানমন্ডির বাড়িতে উঠেন। ধানমন্ডির বাসায় অস্থানকালে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারী সদ্য কারামুক্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেন। জ্যোতিঃপাল মহাথের তাঁর মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে প্রণীত "বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম" গ্রন্থে (১৯৭৭) লিখেছেন, 'আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমার এক পার্শ্বে বঙ্গবন্ধুর তদানীন্তন প্রেস সেক্রেটারী জনাব আমিনুল হক বাদশা এবং আরেক পার্শ্বে মুজিবনগরের পরিচিত এক বন্ধু জনাব বাদশা বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বাংলাদেশে আন্দোলনে আমার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন। বঙ্গবন্ধু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম, না, আমি বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে পারিনি। তবে দেশ বিদেশে গিয়ে মানুষের কাছে বাংলাদেশের জন্য কেঁদেছি। তিনি আমার কথা শুনে খুব আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন'।[৬]

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত পুণ্যপুরুষ জ্যোতিঃপাল মহাথেরর বর্ণাঢ্য জীবন প্রদীপ নিভে যায় ৯২ বছর বয়সে ২০০২ সালের ১২ এপ্রিল। একজীবনে জাতি, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র এবং মানবতার জন্য কাজ করার সৌভাগ্য সবার হয় না। কিন্তু পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান মহান ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রান্ত সীমানায় উপনীত হওয়ার পরও তাঁর সারগর্ভ, তথ্যবহুল ঐতিহাসিক বক্তব্য এবং বাচনভঙ্গি ছিল অন্তরছোঁয়া। বিশিষ্ট সাহিত্যিক **অধ্যাপক আবুল ফজল বলেছেন,**" মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী।[৭] বাংলাদেশের বৌদ্ধদের একটি জাতীয় প্রতিষ্টানের প্রধান হিসেবে তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ছিল একদিকে মিথ্যার সাথে আপোষহীন, অন্য দিকে ছিল অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। মহামানব গৌতম বুদ্ধের সাম্য-মৈত্রী-করুণা ও অহিংসার আর্দশে নিবেদিত-প্রাণ গৈরিকবসনধারী এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুক্তি সংগ্রামকালীন কর্মতৎপরতা, বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে শুরু করে, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব এশীয় বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলোতে ব্যাপক সফরের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর নৃশংস নির্যাতন ও গণহত্যার সঠিন বিবরণ প্রচার ও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে প্রভুত সহায়তা করেছিল। তাই মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই দুঃসহ ভয়াবহ দিনগুলিতে বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসেবে দেশ-বিদেশে খ্যাত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন।"

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে পূর্ব-পশ্চিম বিরোধের পটভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিল 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের উল্লেখ করেন যে, সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পর প্রথম বারের মত পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ ইং জানুয়ারি পর্যন্ত। এই সাধারণ নির্বাচনে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করেছিল যে, দেশের জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আওয়ালী লীগের ধর্ম নিরপক্ষে ও গণতন্ত্রমূলক কর্মসূচির পিছনে রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে জন্য নির্ধারিত ১৬৯ জন প্রতিনিধি মধ্যে আওয়ালী লীগ সদস্যই নির্বাচিত হলেন ১৬৭ জন। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকারের নিকট অসহ্য গাত্র দাহের হেতু হয়ে দাঁড়ায় আইনসঙ্গতভাবে আওয়ামী লীগ দেশের শাসনভার পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু সকল নির্বাচিত সদস্যগণের সম্মিলিত পরামর্শে জাতীয় গণপরিষদে

একসঙ্গে বসে শাসনতন্ত্র আলোচনা বা প্রণয়ন করার অধিকার পাওয়া গেল না। অথচ এই নির্বাচনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শাসকতন্ত্র রচনা করা। বস্তুত নির্বাচনের প্রতি পাকিস্তান সরকারের একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা।[৮]
প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। পূর্বঞ্চল কমান্ডের অধিনায়ক বা জিওসি জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব ঢাকা গ্যারিসনের অফিসারদের এক সমাবেশ ভাষণ দানকালে আয়ুব সরকারের পতনোত্তর ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি ভাষণের সমাপ্তি মন্তব্য করেছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে এখন চূড়ান্ত পর্যায় এসে গেছে। অবশ্য তিনি একথাও বলেছিলেন আপনারা ওদের বাঙালিদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগনকে বলেছিলেন আমি একজন সৈনিক আমি ব্যারাকে ফিরে যেতে চাই। জনগনকে আশস্বত করার মত ভাষার তিনি এভাবে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন-পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন অধিবাসীকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে অংশগ্রহণের ব্যাপরে উদ্ধুত করতে হলে তাদের সরকারি পর্যায় প্রাপ্য সুযোগ দেওয়া উচিত । কি সহজ স্বাধ্য সত্য সরল তরল স্পট সংক্ষিপ্ত উক্তি। এতে জনগণ অবচেতন ব্যক্তিবর্গ একেবাবে যুক্ত। এতে সন্দোহমূলক প্রমাদ গণবার কি আছে? এদিকে সব কিছুর ব্যাপারেই পশ্চিম পাক্তিস্তানীরা সিংহভাগ উপভোগ করত। বিদেশি সাহায্যের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়োজিত হতে তাদেরই জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রা আয়ের অংক একইভাবে আমদারিকৃত দ্রব্যের জন্যে । পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রা আয়ের অংক একইভাবে আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হতো। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের শতকরা ৯০ ভাগ এবং সেনাবাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে ওদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সুস্পষ্ট কারণেই ছয় দফা অথবা এর প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের প্রতি ইয়াহিয়া খানের অনুকূল ধারণার উদ্ভব হয়েছিল বলে জনগণের বিশ্বাস জন্মে ছিল। কিন্তু এটা যে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি রাজনৈতিক চাল বা রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ব্যতীত সকলের বোধগম্যে আসেটি। জনগণের এই ধারণার ভেতর কুঠারাঘাত আনল ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকার যখন সাইক্লোন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল তখন তারা জ্বলন্ত অবজ্ঞা ঔদাসিন্য ভাব তার কীর্তিকে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল ।[৯]

বাঙালির প্রতি প্রকৃত মনোভাব উম্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। আসল চরিত্রটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত গভর্ণর ও সাময়িক আইন প্রশাসকদের এক অধিবেশন জনশ্রুতির মাত্রা বেড়ে দেয়। এখানে ইয়াহিয়া খান সমবেত সবাই জানিয়ে দেন, ৩রা মার্চ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিলো তা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। এডমিরাল আহসান এবং লেঃ জেনারেল রহমান গুল উক্ত সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্টকে বারংবার জানান। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাদের কথায় কর্ণপাত না করে তার সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকেন। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আহসানকে ঢাকায় গিয়ে ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার বিষয়টি ২৮ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে অবগত করনো হয়। এর ফলে বাংলাদেশে উগ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে । সারাদেশে এ ভাষণের পরপরই জনগন রাস্তার ক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদ মিছিরে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহর বন্দর রাস্তা ঘাট ভরে উঠে। লেঃ জেনারেল ইয়াকুব কারফিউ জারী করে সেনাবাহিনী যুদ্ধাববস্থার তৎপরতায় সড়ক পাহারা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এডমিরাল আহসান আবার একই বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টকে বারবার অনুরোধ করতে আহসানের প্রতি সন্দেহ জন্মিল যে, তিনি হয়তো পূর্ব পাকিস্তান প্রিয়। ফল ফলল বিপরীত সেই রাতেই আহসানের পদচ্যুতি ঘটল। অন্যতম যুদ্ধবাজ লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে ইসলামাবাদে ডেকে এনে আহসানের স্থলে নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বারংবার বিষোদগার করে বিভিন্ন উক্তি করেছিলেন। টিক্কা খানও অনুরুপ উক্তি বারবার করেছেন। যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদত্ত হলে আমি ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো । টিক্কাকে প্রদত্ত পরিকল্পনার বিষয় হল শেখ মুজিব এবং আওয়ালী লীগ পন্থীকে নিশ্চিহ্ন করা হোক। খান শাসকমণ্ডলী ধারণা করেছিলেন যে বন্দুকের নলে ও কামানোর ফুৎকারের বাঙালি জাতিকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শিমুলের তুলার ন্যায় উড়িয়ে দেবেন ।[১০]

কিন্তু পাকিস্তানী জান্তা বিভাগ ধারনা করতে পারেননি যে, বাঙালি দুই হাত পরিমিত বাশের লাঠির মধ্যে বৈজয়ন্তী শক্তির উপাদান কত পরিমাণ প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে নিহিত ছিল। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রনায়কোচিত জ্ঞান ও বাগ্মিতার সেরা নিদর্শনে অস্থির জনসমূদ্রকে দীর্ঘতম মহাকাব্যের কথা স্বল্প কথায় বলেন। রমনা রেসকোর্স সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের আগমন সত্যিকার অর্থে এক জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। মন্ত্রমুগ্ধ জনতা যেন স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত ত্রানকর্তার কণ্ঠস্বরটি শোনে। কণ্ঠস্বরটি বলতে থাকে।

"তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তৈরি হও। আমি সেদিন হুকুম দেওয়ার সময় নাও পেতে পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

পশ্চিমা শাসকমণ্ডলীর বহুদিনের পোষিত আশংকা ছিল যে, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। তদ্ধেতু বহু বছর যাবত সরকার নানা প্রকার তালবাহানা করে সময় কাটিয়ে আসছিলেন। পাকিস্তানের সামায়িক শাসকচক্র এতদিন যে, জনগনের ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনীতির ছাচে ঢেলে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাচ্ছিলেন তা আওয়ামী লীগের স্বচ্ছ রাজনীতির প্রভাব চিরতরে নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা এবার প্রমাদ গুণতে শুরু করলেন। তারা প্রমাদের উন্মাদনায় রাজনীতির সুষ্ঠু পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে নিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তাই তৎকালীন সাময়িক শাসকমণ্ডলী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রত্যেক ধাপে তাল বাহানা ও প্রতারণা শুরু করলেন। এতে এই প্রমাণিত হল যে, তারা কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের শাসনভার ও কর্তৃত্ব বাঙালিদের উপর ছেড়ে দিতে নারাজ । স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য ধর্ম - নীতি ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনে যে কূটবুদ্ধি খেলেছিল তা চিরতরে খসে পড়ল। অধর্মের প্রভাবে ধর্মের বন্ধন আর অক্ষুণ্ন রাখতে পারল না। ভেদবুদ্ধি ও ভেদ- জ্ঞান এসে তাঁদের অন্তরকে কলুষিত করল। মনুষ্যত্ব বোধোর বিলোপ সাধন করল।

স্মতব্য একটি জাতিকে বন্ধন, রক্ষণ ও সার্বভৌম অভ্যুদয়ের জন্য শুধু ধর্ম নয় কিংবা ধর্মের ন্যায় একটিমাত্র উপাদান যথেষ্ট নয়। এই জন্য বহু উপাদানের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। ভৌগোলিক সংস্থান, সংস্কৃতির সম্পর্ক, ইতিহাসের ক্রমঃধারা, ভাব ভাষার একত্ব ও স্বভার চরিত্রের সামঞ্জস্য না থাকলে জগতে কোন জাতি গঠিত হতে পারে না। জুলুম ভিত্তির অযৌক্তিক কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিংবা সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্ট হলেও জগতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আালাদা দুই অঞ্চলের মধ্যে ২০০০ হাজার মাইলের ব্যবধান ঐসব যাবতীয় পার্থক্য অঙ্গীকার করে শুধু একটি মাত্র বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এক জাতিতে পরিত করতে যাওয়া স্বার্থ সিদ্ধির একটি বিরাট ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু না। এ সম্পর্কে রাজনীতিজ্ঞ নেতারা যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তাঁদের বাণী পরিণতিতে যথার্থ সত্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে বিপুলভোটাধিক্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনই পাকিস্তানী শাসক মন্ডলীর সকল দুরাভিসন্ধি পূর্ণ উদ্দেশ্যের মূল্য কুঠারাঘাত বিবেচিত হওয়ায় তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যে কোন উপায়ে হোক দূর ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তুলতে হবে। তদ্ধেতু তাঁরা জাতির অগ্রবর্তী অংশ উর্বরা শক্তিসম্পন্ন মস্তিক বুদ্ধিজীবী, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর ছাত্র সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন, নিরন্ত্র নিরীহ গণ-হত্যা এবং সংখ্যালঘু অমুসলমান সম্প্রদায়কে কাফের আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে সমূলে উচ্ছেদ ও বিতাড়নের দূর্দষ অভিযান শুরু করলেন। এই অভিযানে যদি নিহত ও বিতাড়িতের সংখ্যা কয়েক কোটিতে পৌঁছে যায়, তা হলেই তো পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু অংশে উপনীত হয়ে একটি বোবা বধির ও গোলাম জাতিতে পরিণত হয়ে যাবে। চিরকালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের পদানত হয়ে থাকবে। এই উদ্দেশেই তারা ধ্বংস যজ্ঞের রক্তাক্ত অবিযান আরম্ভ করেছিলেন। বাঙালি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প বাণিজ্য সব কিছু ধ্বংস করে নির্মূল করার অভিযান সুপারিকল্পিতভাবেই চালিয়ে ছিলেন। জীব সৃষ্টির নীতি যতদিন জগতে বক্ষে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন কেউ ভুলতে পারবে না যে, ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দুইশত ছয়ছট্টিটি রক্তাক্ত ও বিভীষিকাময় বাঙালি জীবনের দিনগুলোর কথা। বিশ্বকোষে রক্তাক্ত বর্ণমালায় তা করুণ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ থাকবে চিরকালের জন্য। ঐতিহাসিক ২ রা মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টা থেকে রাজধানী ঢাকার বক্ষে গণ হত্যার তান্ডবলীলা আরম্ভ হয়। ঘুমন্ত ঢাকার উপর আক্রমন চালাবার জন্য সামারিক শাসকগোষ্ঠী সাজোয়া ট্যাংক গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়ান ব্যবহার করে এক লোমহর্ষক হৃদয় বিদারী ব্যাপক গন হত্যায় নিযুক্ত হয়। ২৬ শে মার্চ থেকে ঢাকা শহর ত্যাগ করে লাখ লাখ মানুষ পালাতে আরম্ভ করে। ঢাকা শহরের সর্বত্র গণহত্যা, লুট- তরাজ, অত্যাচার, উৎপিড়িত, জনহিতকর, সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, নারী নির্যাতন আরম্ব হয় এবং ঢাকা থেকে ক্রমশ ঃ মফস্বলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার দিকে দিকে, শহরে বন্দরে, গ্রাম গ্রামান্তরে ধ্বংসলীলা, নিধনযজ্ঞ অবাধ গতিতে চলতে থাকে।

বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের মাসিক পত্রিকা

বিশ্ববৌদ্ধ সৌভাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে ভীষণ সন্ত্রাস ও মহাদুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন কল্পে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রেসিডেন্ট মাননীয় জ্যেতিঃপাল ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট বৃহস্পতিবার ব্যাংককে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি ভদ্রলোক ।[১১]

তাঁর আগমনের পর দিন বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে এসে সভানেত্রী ও সেক্রেটারী জেনারেল এর সাথে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে যে আতংক ও দুঃখ দুর্দশা ভোগের চরম অবস্থা বিরাজমান মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সভানেত্রী ও সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট তা বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছিন। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা বিশ্ব মানবের স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে তা সর্বাধিক দুঃখপূর্ণ ঘটনার অন্যতম । বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধজনগণ দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং তিনি নিজেও ত্রিশজন ভিক্ষু শ্রামণ সহ ভারত সীমান্ত এসে পৌঁছেন। ব্যাংককে অবস্থানকালীন মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের ব্যাংককের প্রসিদ্ধ বিহার মার্বেল টেম্পলে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সদ্ধর্ম প্রধান দেশের স্ব-ধর্মীয় লোকের নিকট পাকিস্তানী বৌদ্ধ শরণার্থীদের জন্য প্রয়াজনীয় সাহায্যের সন্ধানই তাঁর ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের ১৯৭১ সনের ১৬ ই আগস্ট জাপানের উদ্দেশ্যে ব্যাংকক ত্যাগ করেন এবং সেই মাসেই ২২ তারিখ নয়াদিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর এই ভ্রমণের খরচ বহন করেন তাঁর আচার্য ও সহগামী মুসলিম বন্ধু। মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বললেন যে, ভারতের আগরতলায় প্রাচ্যবিদ্যা বিহারে তিনি অবস্থান করবেন। বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটি থাইল্যাণ্ডে ও বিশ্বের সর্বত্র প্রেরিত ও প্রচারিত হওয়ায় বাংলাদেশের স্বপক্ষে আমাদের বিশ্ব জনমত সংগঠন এবং স্বীকৃতি লাভের সন্ধান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরো আরো বলেন, তাই বলি কলম্বো বা টোকিওতে আমাদের যে কর্ম তৎপরতা সম্পাদিত হয়েছে তা সেই সেই দেশের অভ্যন্তরের সীমাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু ব্যাংককের ব্যাপক তৎপরতা বিশ্বের সকল দেশে প্রচারিত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাতে বৌদ্ধ জগতে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশেষত বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সভানেত্রী রাজকুমারী পুনপিসমাই দিস্কুল পাকিস্তানের প্রসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, থাইল্যাণ্ডে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উঃ থান্টের নিকট পত্রের আদান প্রদানের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করেন। পাকিস্তানী বৌদ্ধদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশ্বের কতিপয় বৌদ্ধ বিশিষ্ট রাষ্ট্র থেকেও পাকিস্তানী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। যার ফলে পাকিস্তান সরকার বৌদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য পরিচয় পত্রের প্রচলন করেছিলেন। এই পরিচয় পত্রের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী লোকেরা বহু অর্থ উপার্জন করেছে। বহু অবৌদ্ধকে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতে গিয়ে অর্থাগমের পথ সুগম করেছে মাত্র। চিন্তাশীল লোক মাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন ব্যতিরেকে পাকিস্তান সরকার চার সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত রাষ্ট্রে শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য কি দয়ায় পড়েই তৎপর হয়েছিলেন- না দায়েপড়ে করেছিলেন।

নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান

পণ্ডিত জ্যোতি:পাল মহাথের রচিত 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে' বইতে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করার পেক্ষাপট তুলে ধরেন উক্ত বইতে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখে নয়াদিল্লীতে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে আমি বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রণ পেয়ে অংশগ্রহণ করেছি। এবং বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দিয়েছি। এই সম্মেলনে বিশ্বের ৩১ টি রাজ্যের প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা চিলেন চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পরবর্তীকালে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার ডক্টর এ আর মল্লিক। বাংলার বিখ্যাত মনীষী সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। প্রতিদিন এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতের সর্বোদয় নেতা শ্রীজয় প্রকাশ নারায়ণ। তিনিই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। সম্মেলনের প্রথম দিন সর্ব প্রথম বক্তা ছিলেন ডক্টর মল্লিক । অধিকৃত বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের প্রতিনিধি বর্গের সম্মুখে বিরাট জনাকীর্ণ সমাবেশে ড. মল্লিক দীর্ঘ এক ঘণ্টা যাবত যে মর্মস্পশী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করলেন তাতে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সভাগৃহে দর্পণের ন্যায় তুলে ধরা হয়েছে । তার বক্তৃতার পর সভাগৃহ স্তম্ভিত ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিতে সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯ শে সেপ্টম্বর রবিবার সভার পরে এক ঘরোয়া বৈঠকে The World Conference of Religion for Peace এর সেক্রেটারী জেনারেল ড. হোমার জ্যাকের সাথে আমি মিলিত হয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় ব্যাপৃত হই।[১২]

এসব আলোচনার ভিত্তিতে তিনি অধিকৃত বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্র থেকে যে সকল প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, আমি তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ করে দিল্লী জগজ্যোতি বিহারে নিয়ে যাই এবং বৌদ্ধ ও অন্যের উপর পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করি। এই বৈঠকে নেতৃত্ব করেছেন সিংহলের যোগাযোগ মন্ত্রী ও Ceyleon Committee for human rights in East Bangal এর চেয়ারম্যান মিঃ সেনাপথ গুন বর্দ্ধন ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও Bangladesh Iiberation Committee এর চেয়ারম্যান ড. টি নারা । জগৎজ্যোতি বিহারের অধ্যক্ষ আয়ুস্মান শ্রী ধর্মবিরিয়ো অভ্যাগত প্রতিনিধিগণকে মিষ্টি, নানা প্রকার সুস্বাদু

ফল ও চা চক্রে আপ্যায়িত করেন। আন্তর্জাতিক এই মহা সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর আয়ুষ্মান শ্রী ধর্ম বিরিয়োর সৌজন্যে ও সহযোগীতায় আমি ভারতীয় সাহায্যে পুর্নবাসন মন্ত্রী মাননীয় আর, কে খাদিল করের সাথে কয়েকবার সাক্ষৎ করি। এই সাক্ষাৎ কারের উদ্দেশ্য হলো আগারতলায় যে সব শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামণ আছেন, সোজা সরল কথায় বলতে গেলে তারা আহারে বিহারে রীতিমত কষ্টে আছেন। মিঃ খাদিলকর সাহেবের অনুগ্রহ লাভে তাদের কষ্টের কিছু লাঘব করা সম্ভব এই উদ্দেশ্য আয়ুস্মান ধর্ম বিরিয়োর চেষ্টা যত্নে মিঃ খাদিলকর আগারতলায় শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামণগনের জন্য এগারো হাজার সাতশত টাকা মঞ্জুর করে পাঠান। এই মঞ্জুরীকৃত টাকা আমাকে দেওয়া হবে আগারতলা সাহায্য পূনবাসন তহবিল থেকে। তাই আমার আগারতলার পৌছানো প্রয়োজন। অতঃপর আমি আগরতলা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাংলাদেশ মিশন আমাকে কলকাতা হয়ে আগরতলা পৌছানোর জন্য বিমানের টিকেট ক্রয় করে দিলেন। টিকেট পাওয়ার পর হঠাৎ মাথায় আরেক বুদ্ধি চাপল। সহসা কি আবার দিল্লী আসতে পারব? দিল্লী আসতে পারব ? দিল্লীর আশে পাশে যত তীর্থস্থান, যত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, নয়নাভিরাম দর্শণীয় বস্তু আছে, একেবারে কিছু না দেখে সরাসরি আকাশ মার্গে উড়ে চলে যাওয়া কিছুতেই উচিৎ হবে না। আন্তত কিছু দেখে যাওয়া দরকার। এই সিদ্ধান্ত বিমানের টিকেট বাতিল করে ৪৫০ টাকা পেলাম। তাতে আগ্রার তাজমহল, হুমাইুন কেল্লা, ময়ুর সিংহাসন, জামে মসজি, দিওয়ান- ই খাম প্রর্ভৃতি মোগল যুগর পুরাকীর্তি ও মথূরা বৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করলাম। আরো উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত কুর্বাতুল ইসলাম মসজিদ, ইসলামী স্থাপত্য বিদ্যার এক উল্লেখযোগ্য নির্দশন এবং সারা মুসলিম জাহানে গৌরবের বস্তু। এটার প্রতিষ্ঠাতা আইবক ছিলেন প্রথম সুলতান। পরবর্তীকালে ইন কুবুমিন ও আলা উদ্দিন এই মসজিদের সম্প্রাসরন করেন। ২৩৪ ফুট উচ্চ কুতুব মিনার ইসলামের আধিপত্য প্রভাবের বার্তা আজও বহন করছে। আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া কুতুবুদ্দিন ও ইল তুত মিসের শিল্পপ্রীতি অন্যতম বিখ্যাত নির্দশন। খলজি যুগে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম বিখ্যাত নিদর্শন হলো আলাউদ্দিনের নির্মিত আলাই দারুয়াজা হুমাইুন মসজিদ প্রভৃতি। গান্ধী পার্ক, গান্ধী ও নেহেরুর শ্মশান, নেহেরু যাদুঘর, বিরলা মন্দির, লাদাক বৌদ্ধ বিহার, লাল কেল্লা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে অবস্থান কালে অবস্থানকালে এসব কীর্তি ফাকে ফাকে দর্শন করেছি। বৌদ্ধ জগতে শ্রী সত্য নারায়ণ গোয়েঙ্কা একজন বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধাচার্য, বিদর্শন ভাবনা গুরু। তাঁর পূর্ব পুরুষের বাসভূমি হচ্ছে বোম্বে। তার পিতা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বার্মায় গিয়ে বহুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। গোয়েঙ্কাজীর জন্মস্থান বার্মাদেশে। তিনি ছোট বেলা থেকে শিরপীড়ায় ভুগতেছিলেন। তার অর্থাভাব মোটোই ছিলনা। তিনি শিরপীড়া আরোগ্যকল্পে পৃথিবীর কোন দেশের কোন ডাক্তার বাকী রাখেননি। কিন্তু শিরপীড়া কিছুতেই নিরসিত হলনা। অবশেষে বার্মাদেশে ফিরে এসে তার এক বিশিষ্ট বন্ধুর পরামর্শে বৌদ্ধ সাধনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বিদর্শন ভাবনায় নিরত হলেন। এই বিদর্শন সাধানার প্রভাবে তনি পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করলেন। সাথে সাথে আজীবন দুভোগ্যে শিরপীড়াও চিরতরে উপশমিত হয়ে গেল। তিনি নবজীবন লাভ করলেন। বর্তমানে তিনি বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ইগতপুর নামক এক পাহাড়ে এক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কেন্দ্র বিশ্বের সকল সম্প্রাদায়ের লোক সমবেত হন এবং বির্দশন অনুশীলন করে আত্ম বিশুদ্ধি ও জীবন মুক্তি লাভ করেন। প্রতিদিন বিশ্বের তিন শতাধিক লোক তার কেন্দ্রে অনুশীলন রত থাকেন।দিল্লী অবস্থানকালে আমি তার পবিত্র সান্নিধ্য লাভ পরম সৌভাগ্যশালী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদিন সন্তনগনের জগজ্যোতি বিহার প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় রেল ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে । উভয় দিনই তিনি বির্দশন ভাবনা সম্পর্কে অমৃতবারি বর্ষণ করলেন। তার সুমধুর ভাষন শ্রবণে জীবন ধন্য করলাম।অতঃপর দিল্লী ত্যাগ করে গয়া কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হব। এমন সময় ফরুক্কাবাদ জিলার নিবকরোবি থেকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। পত্র লেখক হচ্চে শ্রী শিমুল কান্তি বড়ুয়া। তিনি সেখানকার বৈদ্যুতিক ফার্মে বহুদিন ধরে কাজ করে আসছেন। নিবকরোরি হচ্ছে দিল্লী ও গায়ার ঠিক মাঝামাঝি পথে অবস্থিত। আরো আনন্দের কথা হলো নিবকরোরির পাশেই বৌদ্ধযুগের শাঙকাস্য নগর সেখানে এখানো বৌদ্ধ স্তুপ মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় বস্তু ও তথ্যগতের অনন্ত গুনাবলী স্মরণ পূজা করার অনেক উল্লেখযোগ্য নির্দশন রয়েছে ।২৭ শে সেপ্টেম্বর সোমবার বিশ্বশান্তি স্তুপ দর্শন করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম এই স্তুপ অর্পূব প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের চারু শিল্প কারু শিল্প এবং বর্তমান যুগের অভিনব আধূনিকতার অর্পূব সমন্বয় রাজগৃহের এই বিশ্বশান্তি স্তুপ। এটা রাজগৃহের সর্বোচ্চ পর্বত শীর্ষে অবস্থিত। এই স্তুপ দর্শনের জন্য পর্বত শীর্ষে উঠার যে বিদ্যুৎ চালিত পদ্ধতি তাও ভারতবর্ষে একান্ত অভিনব ও অদ্বিতীয়। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে দেখেছি বিদ্যুৎ চালিত সিঁড়ি। পিনাঙ্গে দেখেছি পর্বত শীর্ষে আরোহন করার বিদ্যুৎ চালিত রেলগাড়ী আর রাজগৃহে দেখলাম বৈদ্যুতিক তারে ঝুলানো যাত্রীবাহী চেয়ার। পণ্ডিত আনন্দমিত্র মহাস্থবির ও আমি পর্বত পাদদেশে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে পড়লাম। চেয়ারগুলো তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুক্ষিতে ধারণ করে আমাদিগকে পর্বত শীর্ষে বিশ্বশান্তি স্তুপের প্রাঙ্গনে নিয়ে পৌছায়ে দিল। বিশ্বশান্তি স্তুপের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্রাই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এই নমুনার বৌদ্ধ স্তুপ সিংহল, বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে এরুপ রাশি রাশি স্তুপ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের বৌদ্ধ যুগের এরূপ স্তুপের অভাব ছিল না। কিন্তু আজ ভারত বাংলায় এই পদ্ধতির কোন স্তুপ দৃষ্টি গোচর হয় না। আমি বিশ্বশান্তি স্তুপটি তিনবার প্রদর্শন করে তথাগত বুদ্ধের অনন্ত গুণাাবলীর কথা স্মরণ পূর্বক ভক্তি প্রণতঃ শিরে

অভিবাদন করে ও অধিকৃত বাংলাদেশের আশুমুক্তি ও সাম্য শান্তির কল্পনায় প্রার্থনা জানাই। স্তুপ দর্শন করে আমরা বিদ্যুৎ চালিত চেয়ারে আর অবতরণ করলাম না। কৌতুহল বলে অবতরণ করলাম পর্বত গাত্রে নব নির্মিত স্থাপত্য সিঁড়ি বেয়ে। অবতরণকালে সিঁড়ির পাশে গৃহ্যকুট পর্বত দৃষ্টি গোচরে এলো যেখানে একদা মহাকারুনিক তথাগত বুদ্ধ অবস্থান করেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গয়ার থাই বিহরের অধ্যক্ষ রাজগৃহ থেকে ফেরার পথে আমরা তার সাথে সেই দিনই বুদ্ধ গয়ায় প্রত্যার্বতন করি।

ঐতিহাসিক আগরতলায় আগমন

আগরতলা যাওয়ার প্রসঙ্গে পন্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরো বলেন, ৮ই অক্টোবর শুক্রবার আমি আগারতলার উদ্দেশ্য কলকাতা ত্যাগ করি। বিমান আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করে দৈত্যগতিতে উড়ে এসে গৌহাটিতে অবতরণ করল। তারপর বিমানের ইঞ্জিনে গোল যোগ লেগে যাওয়ার সেদিন আর আগারতলা পৌঁছা গেলনা। এক রাত্রি গৌহাটি থাকতে হয়েছে। পরদিন সকাল ১১ টায় আগরতলায় পৌঁছলাম।আগারতলা বেণুবন বিহারে যে সব, শরণার্থী ভিক্ষু শ্রাবণ ছিলেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সুখ দুঃখের খবর নিলাম। বাংলাদেশ মিশনের কর্মর্কতা জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরী, জনাব আকবর আলী খান ও ড. হোসেন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বিদেশে আমাদের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করি।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরনার্থী শিবির থেকে সমস্ত বৌদ্ধ শরণার্থীগণকে যে তোতা বাড়ী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল- তাদের খবর নিতে গিয়ে বড়ই মর্মাহত হলাম। শরণার্থী পরিবারের মধ্যে খুব কম পরিবারই আছে যে পরিবার মাতা বা পিতাকে ভাই বা বোনকে, ছেলে বা মেয়েকে না হারিয়েছে। কোন কোন পরিবার একেবাবে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আরো মর্মঘাতী খবর পেলাম বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশস্থ বরইগাঁও গ্রামে আমার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ লুণ্ঠিত, আসবাব পত্র অপহৃত, লাইব্রেরীর শতশত বই পুস্তক অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত।

আগারতলা কয়েকদিন অবস্থানের পর আমার শিষ্য সেবক নিয়ে আমি চলে গেলাম নব প্রতিষ্ঠিত "আগারতলা বৌদ্ধ মিশনে" যা বিদেশ গমনের পূর্বে জায়গা খরিদ করে একটি বুদ্ধ মন্ডপ ও ভিক্ষুদের জন্য একটি বাসগৃহ নির্মাণ করে একজন বুড়ো শিষ্যকে রেখে গিয়েছিলাম সেই আমতলী সূর্যমনি নগরে। এই নব নির্মিত আশ্রমের নাম করণ হয়েছে "আগতলার বৌদ্ধ মিশন"। এটার সংস্থিত স্থানটি আগরতলা থেকে তিন মাইল ব্যবধানে দক্ষিণগামী রোড়ের পূর্বধারে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। এখান থেকে আগারতলা যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা। প্রতি ২/৪ মিনিট পরপর বাস সার্ভিস দক্ষিণ ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। আমতলী বাজার পর্যন্ত টাউন সার্ভিস বাস। হাইস্কুল, জুনিয়ার হাই স্কুল, পোষ্ট অফিস, হাটবাজার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা করেই এই স্থান পছন্দ করেছি ভবিষ্যতে অনেক আশা আকঙাকায়।

এখানে আমি শিষ্য সেবক নিয়ে দিনগুলো অতিবাহিত করেছি। উত্তর পার্শ্বে টিলায় ছয় হাজার শরনার্থী অধ্যুষিত বিরাট শিবির। দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে স্থায়ী বাসিন্দা লোকজনের বাস। দিনরাত আমার আশ্রমে ভক্ত সমাগম। মাঝে মাঝে ভক্তবৃন্দের মনো বিনোদনকল্পে শাস্ত্র পাঠ ধর্মালোচনা হত। ভক্ত বৃন্দের মধ্যে শ্রী পরেশ নাথ আচার্য্য তার সহধর্মিনী শ্রীমতি শান্তি বালা আচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারা শুধু ধর্ম ভক্তির পরিচয়ই দেননি, আমার প্রাত্যাহিক জীবন জীবিকা নির্বাহের তত্ত্বাবধানও করতেন। তাদের, স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধা ভক্তির কথা আমি জীবনও ভুলতে পারব না। ভুললে আমার জীবনই মিথ্যা হয়ে যাবে। এরূপে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আশ্রমের প্রতি স্থানীয় জন সাধারণ ও সরকারের শুভ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল যে, আশ্রমের ভবিষ্যৎ অতিশয় সমুজ্জল।[১৩]

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে আমার হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ বহু সংখ্যক ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারূপে যোগ দিয়েছিলেন। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের কেউ সুস্থ দেহে কেউবা জীবন্তে মৃত প্রায় হয়ে ফিরে এসেছেন। আর কেউ বা ফিরে আসেন নি। মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে চিরতরে অনন্তে বিলীন হয়ে গেছেন। তারা সবাই যুদ্ধে নামবার প্রাক্কালে দোয়া দাক্ষ্যিনের সন্ধানে আমার নিকট উপস্থিত হতেন। আমি তাদেরকে বাংলাদেশের আর্দশ, স্বাধীনতার মহাত্ম্য, দেশাত্মাবোধ এবং পরাধীন জীবনের দুর্বিসহ দুঃখ অশান্তি সম্পর্কে নানাভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রানিত, ও উদ্দীপিত করেছি। এতে তারা খুব আনন্দ ও গৌরববোদ করতেন।

নভেম্বর প্রায় শেষ। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে প্রায়দিনই গোলাগলির শব্দ শোনা যায় তাতে মানুষের অন্তর সন্ত্রস্ত। এদিকে দেখা যায় আগারতলা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরায় যোগাযোগ রক্ষাকারী রজিপদটি অহরহঃ ব্যস্ত। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পিপঁড়ার মত অসংখ্য যান বাহনের ক্ষণে ক্ষণে আনাগোনা। এক মিনিটের জন্য ফাক নেই বিশ্রাম নেই। যানবাহনের অবিরাম যাতায়তের দাপটে মুহুমূর্হ কর্ণ বিদায়ী বিকট শব্দে অতিষ্ট হয়ে যেতাম। এতে অনুমান করা অযৌক্তিক হয়নি যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন। এরূপে কয়েকদিন চললো আকাশ বানীর মারফত হঠাৎ শুনতে পেলাম ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখ বৌদ্ধ রাষ্ট্র ভূটান সর্ব প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করল। তৎপূর্বে ব্যাংকক থাকাকালিন ভুটান ব্যাংককে আমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখ পাকিস্তান ভারত আক্রমন করেছে। অমনি ৫ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি ভারত। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। তারপর থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী উভয়ের যৌথ উদ্যোগে ও সহযোগিতায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। মাত্র দশ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ১৬ ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী পরাজয়ের মর্মবেদনা চরম পর্যায়ের পড়ে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে। তস্থবনে বাঙালি জাতি ও ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দর্শন মানসে

'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম' বইতে পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ ই জানুয়ারি সোমবার বেলা ৪ টার সময় ঢাকা সে পৌঁছবেন। আমি ১০ তারিখ ভোর ৬ টায় ঢাকার উদ্দেশ্য বরইগাঁও ত্যাগ করি। আমার সঙ্গে আছেন রাঙ্গামাটির ভিক্ষু অমৃতানন্দ। চাঁদপুর থেকে ঢাকাগামী লঞ্চ ৮/৯ মাইল চলার পর হঠাৎ এক জাগায় থেমে গেল। লঞ্চের ইঞ্জিনে কি একটা গোলযোগ লেগে যাওয়ায় লঞ্চ আর অগ্রসর হলো না। জানতে পারলাম লঞ্চ আর চলবে না। ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে দশানী মোহনপুর অবতরণ করলাম। মোহনপুর হাই স্কুলে আমার ছোট ভাই শ্রী ধীর সেন সিংহ বি এস সি শিক্ষকতার কাজ করে। স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রী নারায়ণ দাস আমার পরিচিত আত্মীয়। আমি যখন হেড মাষ্টারের বাসায় গিয়ে পৌঁছি তখন বেলা একটা । ঘন্টা খানের পরেই হেড মাষ্টার মহাশয়ের ট্রানজিষ্টারটি উদ্ধোধন করে সামনে অনুক্ষণ ধরে রাখলাম। মোহনপুর বসেই বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুর আগমনী খবর, বিমান থেকে অবতরণ ট্রাকে করে পল্টন ময়দানে শোভা যাত্রা সহকারে অগমণ, জনসভায় কর্মসূচী ও বঙ্গবন্ধুর ও জস্বিনী ভাষায় অশ্রুমুখী অভিভাষণ সব শুনলাম। তার আবেগপূর্ন ভাষণ শ্রবণে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লাম।

সকরুণ কণ্ঠে তিনি কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তি করলেন ।

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম, জননী বঙ্গভূমি

গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি'[১৪]

উপসংহারে বললেন- আজ আর বক্তৃতা নয়। বল নেই কয়েকদিন খাওয়া দাওয়া করে বক্তৃতা পরে দিব। তখন আমি সংবেগ সংবরণ করতে পারিনি। চোখের দুই কোঠায় সজোরে অশ্রু ভেসে উঠল। কতক্ষণ পরে কিছুটা সান্তনা বোধ করলাম।

সেই রাত্রি মোহনপুরে যাপন করে পরদিন আমি ঢাকা চলে যাই। ১২ই জানুয়ারি সকাল ৮ টায় সময় ধানমন্ডির ১৮ নং রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তার সাথে মিলিত হলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি. পি বড়ুয়া এবং ভিক্ষু অমৃতানন্দ। আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে দাড়ালাম তখন আমার এক পার্শ্বে বঙ্গবন্ধুর তদানীন্তন প্রেস সেক্রেটারী জনাব আমিনুল হক বাদশা ও আরেক পার্শ্বে বঙ্গবন্ধুর মুজিব নগরে পরিচিত একজন বন্ধু। জনাব বাদশা বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বাংলাদেশ আন্দোলনে আমার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন। তখন বঙ্গবন্ধু আমাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম না না আমি বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে পারিনি, তবে দেশ বিদেশ গিয়ে মানুষের কাছে বাংলাদেশের জন্য কেঁদেছি। তিনি আমার কথায় খুব আনন্দবোধ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে ছেড়ে অন্যান্য দর্শন প্রার্থী লোকের প্রতি মনোনিবেশ করলে তাঁর বাসভবন ত্যাগ করে চলে আসি।

সারাদিন আমি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি.পি. বড়ুয়ার পরামর্শে তার বাস ভবনে বসে বসে বিদেশে আমার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈয়ার করতে লাগলাম। সন্ধ্যার সময় মিঃ বড়ুয়া হঠাৎ বাসায় এসে আমাকে বললেন ভন্তে আপনাকে এক্ষণি ঢাকা বেতারকেন্দ্র বেতারে ত্রিপিটক পাঠের এক প্রোগ্রাম করতে হবে। এই বলে তিনি আমাকে নিয়ে ছুটলেন বেতার কেন্দ্রে। বেতার কেন্দ্র উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমাকে পাঁচ মিনিটের এক লেখা তৈরি করে মাইক্রোফোনে পাঠ করতে হলো। এতে প্রোগ্রাম সংগঠকগন সন্তুষ্ট হলেন। সেইদিন হতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ত্রিপিটক পাটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। আমি প্রতিদিন সকাল

সাড়ে ৬ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক থেকে সত্যের চিরন্তনী বাণী প্রচার করতে থাকি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিদিন সকালে পবিত্র কোরান, ত্রিপিটক, গীতা ও বাইবেল এই চার ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্রোতাদের জন্য বানী চিরন্তণী প্রচারিত হয়।বাংলাদেশ টেরিভিশন থেকে অনুরোধ আসে আমি সেখানেও যেন ত্রিপিটক পাঠ আরম্ভ করি। টেলিভিশনে ত্রিপিটক পাঠ কয়েকমাস চলতে থাকে। এরপর টেলিভিশনে প্রোগ্রাম চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমি মাসের অধিকাংশ সময় মফঃস্বলে কাটাই। কাজেই কর্মকর্তারা টি. ভি. প্রোগ্রাম অন্যান্য লোকজন দ্বারা চালিয়ে নিয়ে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধে মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর ভূমিকা

১৯০৯ সালে ২৩ ফেব্রয়ারী চট্টগ্রামের রাউজান থানার পূর্ব গুজরা হোয়ারাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন বিশুদ্ধানন্দ মহাথের। মহামান্য সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ১৯২৫ সালে তিনি প্রব্রজিত হন, এবং ১৯৩০ সালে ভিক্ষু হিসেবে উপসম্পদা লাভ করেন। প্রথমে নোয়াপাড়া পরে মহামুনি হাই স্কুলে স্কুলজীবনের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১৯৩৪ সালে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রীলংকার বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রী সদ্ধর্মভানক উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে অগ্রসর বৌদ্ধ অনাথালয় প্রতিষ্টার মাধ্যমে তিনি সমাজ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিষ্টায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫০ সালে সংঘের প্রথম নির্বাচিত প্রতিষ্টাতা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেই থেকে আমৃত্যু সংঘের সভাপতির পদ অলংকিত করেছেন। এই সংঘের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধদের সামগ্রিক অগ্রগতিতে নিরলস গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালন করেন। তাঁর জীবনের স্মরনীয় কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৬০ সালের রাজধানী ঢাকায় ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার, ১৯৫৪ সালে বার্মায় অনুষ্ঠিত ষষ্ট সংগীতিতে যোগদান, ১৯৫৬ সালে তাঁর নেতৃত্বে দেশে আর্ন্তজাতিক বৌদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন, ১৯৭২ সালে ধর্মরাজিক অনাথালয় প্রতিষ্টা, বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ১৯৭৮ সালে নব পন্ডিত বিহার প্রতিষ্টা, ১৯৭৮ সালে মহাচীন থেকে বাংলার বরেণ্য সন্তান অতীশ দিপংকরের পবিত্র ধাতু আনয়ান, ১৯৯২ সালে ভারতের বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের বাংলাদেশী তীর্থনিবাস নির্মানের জন্য জমি লাভ ইত্যাদি।[১৫]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মহান নেতা, বাংলাদেশের কৃতী সন্তান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শান্তিবাদী নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ২ মার্চ ১৯৯৮ বুধবার যখন মহাপ্রয়ান তখন মনে হয়েছিল বাংলার আকাশের একটি তারা যেন খসে পড়লো। মহাথেরোর মৃত্যুতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বিরোধী দলীয় নেত্রী, মন্ত্রী ও বিদেশীদের শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি তারই প্রমাণ। তাঁকে একনজর দেখার জন্য শোক মিছিলে অংশগ্রহন করার জন্য লক্ষ জনতার ভিড় একটা বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী মহামান্য সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্ম শান্তি সম্মেলন সংস্থার বাংলাদেশ অঞ্চলের সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সংস্কৃক ও পালি শিক্ষা বোর্ডের সচিব হিসেবেও সুর্দীঘকাল দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মানবতাবাদী বিপুল কর্মকান্ড ও বিশ্বশান্তির জন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ মঙ্গোলিয়া থেকে এশীয় সুবর্ণ শান্তি পদক এবং নরওয়ে থেকে মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অনন্য সংঘমনীষা ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের পাকিস্তান সরকারের নিকট এদেশের বৌদ্ধদের জান-মাল রক্ষার জন্য আবেদন জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সম্মতিক্রমে তিনি বৌদ্ধদের পরিচয় পত্র প্রদান করেন। প্রায় ৭০ হাজার চীনা বুড্ডিস্ট পরিচয় পত্র নিয়ে শুধু বৌদ্ধ নয়, বহু হিন্দু, মুসলিম এবং মুক্তিযোদ্ধারা জীবন রক্ষা করেছিলেন। মহাথের এ সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ জনসাধারনকে অভয় দিয়েছেন, বৌদ্ধদের অবস্থারের কথা অবহিত করেছেন। এ সময়ে তাঁর সহযোগি হিসেবে শহীদ জিনানন্দ ভিক্ষু, শহীদ ননী গোপাল বড়ুয়া, প্রয়াত সংঘনায়ক প্রিয়ানন্দ মহাথের, শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের, প্রয়াত বোধিপাল মহাথের, সংঘনায়ক এস. ধর্মপাল মহাথের, অনুনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের, সাংবাদিক ডি.পি বড়ুয়া, শ্রীমৎ বনশ্রী মহাথের, বাবু শীলব্রত বড়ুয়া, প্রয়াত সুগতানন্দ মহাথের, প্রয়াত শাক্যবোধি মহাস্থবির, উ জিনিতা মহাথের, ডা. ইন্দুভূষণ বড়ুয়া, অশ্বিনি রঞ্জন বড়ুয়া, প্রকৌশলী ব্রহ্মদত্ত বড়ুয়া, উ. পান্ডিতা মহাথের ও আরো অনেকে তাঁর সাথে সহযোগি হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৭১ সালে ১ মে জেনারেল টিক্কাখান বিশুদ্ধানন্দকে ডেকে নিয়ে বিবৃতি দেয়ার জন্য চাপ দেন। তিনি রাজি হলেন না। বিশ্বধর্ম ও শান্তি সম্মেলনে অত্যাচার নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণের বিবরণ তুলে ধরেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে তিনি ঢাকা ধর্মরাজিক

বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন। তিনি শিল্পী আলতাফ মাহমুদ ও দানবীর আর পি সাহাকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী এই বিহার থেকে ঢাকা শহরের একাধিক অপারেশন চালিয়েছেন।[১৬]

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বিশুদ্ধানন্দ মহাথেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র কার্যাবলী নিয়ে ১৯৭২ সালে রচনা করেন 'রক্ত ঝরা দিনগুলিতে' শীর্ষক ৪৫ পৃষ্ঠার এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এই পুস্তিকাটি 'বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' এর চর্তুথ খন্ডে হুবহু বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর জ্ঞান মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে রক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই নয় যুদ্ধকালীন স্বাধীনতা লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ধর্ম, সমাজ, সাংগঠনিক কর্মকান্ড হিসেবে মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের বহু প্রতিষ্টান গড়ে তুলেন। তাঁর এ অমূল্য অবদানের জন্য মহাত্মা গান্ধী শান্তি পদক, এবং বাংলাদেশ সরকারের মহান একুশে পদক প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধে সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের এর অবদান

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ একটি অধ্যায়। এটি বাংলাদেশের জনগণের এক গৌরবময় স্মৃতি। বাঙালির সীমাহীন ত্যাগ ও অসীম বীরত্বের ইতিহাস এই মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হল এর ফসল। বাঙালি দীর্ঘদিন বিভিন্ন কিছুতে বঞ্চিত ছিল, যার ফলশ্রুতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াস। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জাতিসত্ত্বার এক পরম অর্জন। সার্বজনীন অস্তিত্বের সংগ্রাম। জীবন-মরণ বাজি রেখেই সকলে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখানে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের প্রশ্ন ছিল না। পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনই ছিল সকলের ব্রত। বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথা অস্তিত্ব রক্ষাই ছিল সকলের লক্ষ্য। স্বাধীনতাকামী বাঙালি সকলেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে একীভূত হয়েছিল। এমনি এক নীরব মুক্তি সংগ্রামী ছিলেন সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের মহোদয়। এ সময় তাঁর সাধন তীর্থ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এক সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে। নানাভাবে এই বিহারটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনুসঙ্গ হয়ে আছে। তিনি নিজে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ও সম্পূরক বহুবিধ কর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর যাপিত জীবনের এ দিকগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসমান্য অবদান ছিল। তার কিছুটা এখানে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছে। বৌদ্ধ বিহারের অবস্থান সাধারণ গ্রামের কোলাহলমুক্ত নির্জন এলাককায় হয়। সে কারণে গ্রামীন জনপদের বৌদ্ধ বিহার গুলো স্বাভাবিকভাবেই কোন অনুষ্ঠান ও উৎসব ছাড়া জনশূন্যই থাকে। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধকালীন বৌদ্ধ বিহারগুলোর নানামুখী সুযোগ-সুবিধা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একারণে জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহু বৌদ্ধ বিহারে বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন অবস্থান গড়ে তুলে। এখানে মুলত যে কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারের তথ্য পাওয়া গেছে শুধু সেই সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের কাহিনী ওঠে এসছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- ঢাকার ধর্মরাজিক বিহার অন্যতম। এই বিহারটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতাই করেনি, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু মানুষকে আশ্রয় দিয়ে ও জীবন রক্ষা করে ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ বিহাওে অসংখ্য মানুষ যুদ্ধেও প্রথম দিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাদের অনেকেই আবার এখানে থেকেই তাদের সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। এ বিহারে যারা দীর্ঘদিন ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- আওয়ামী লীগের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় নেতা ও পরে মন্ত্রী মি. ফনীভূষণ মজুমদার, সাম্যবাদী দলের নেতা সাবেক শিল্পমন্ত্রী মি দীলিপ বড়ুয়া, বিশিষ্ট হিন্দু নেতা ও ব্যবসায়ী মি. আর, এন, দত্ত গুপ্ত। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন এক মাসের বেশীদিন এই বিহারে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের সুরস্রষ্টা জনাব আলতাফ মাহমুদ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, দেশের কয়েকটি অঞ্চলে স্বাধীনতার খবর পেয়ে তিনি এই বিহার হতে নিজ বাসায় যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে নিখোঁজ ও পরবর্তীতে শহীদ হন। এ সময়ে এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান বৌদ্ধভিক্ষু মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরই একান্ত শিষ্য এবং বিহারের বর্তমান প্রয়াত মহাসংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের মহোদয়। সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিন দুপুর ২টায় দিকে বিশ্বব্যাংকের এক কর্মকর্তা মি. প্রিসলার এক গাড়ি মিলিটারিসহ আমাদের বৌদ্ধ বিহারে আসেন। একজন অপরিচিত বিদেশীকে সেনা বাহিনী নিয়ে বিহারে প্রবেশ করতে দেখে আমি প্রথমে শঙ্কিত হই। কিন্তু মি. প্রিসলার বিহারে এসেছিলেন খুবই মানবিক উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি আমার কাছে দেশের অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। আমি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত নির্যাতনের কথা তাঁর কাছে তুলে ধরি। তিনি আমাকে পরদিন তদানীন্তন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে যেতে বলেন। পরদিন আমি গেলে আমাকে হোটেলের এগার তলায় নিয়ে গিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা ব্রডকাস্টিং এর একজন সাংবাদিকের সাথে আলাপ করিয়ে দেন। উক্ত সাংবাদিক আমার একটা দীর্ঘ ইন্টারভিউ নেন। সে সময় আমি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ নারী-পুরুষের উপর যে হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নি সংযোগসহ অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে তা

বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি। পাক বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার দেওয়ার কারণে পাকিস্তানী সেনা বাহিনী আমাকে ঢাকা বিমান বন্দরে আট ঘন্টা আটকে রেখেছিলেন। বিভিন্ন এজেন্সি থেকে আমার সম্পর্কে তথ্য নিয়ে তারা হয়তো আমাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল। পরে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়। মি. প্রিসলার আমার কাছে আসার মুখ্য কারণ ছিল আমার দুই আত্মীয় খগেন্দ্র লাল বড়ুয়া ও মনি বড়ুয়া আমেরিকায় তাঁর দপ্তরে চাকুরী করতেন। তাদের পরিবারের খবর নেয়ার জন্যই তিনি আসেন। সেই সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর নেন।'ব্যক্ত হউক জীবনের গল্প, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮।

সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরর তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন যে, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিন শাঁখারী বাজার, ঠাটারী বাজার ও পুরানো ঢাকার অনেক বয়স্ক মহিলা ও যুবতী পরিস্থিতির শিকার হয়ে অন্যান্য আশ্রয়ার্থীর মতো আমাদের বিহারে আশ্রয় নেয়। পাড়ার কিছু উশৃখলছেলে তাদের উত্যক্ত করতে চাইলে আমার গুরুদেব বিহারের আঙ্গিনায় বের হয়ে এসে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমার এক ফোঁটা রক্ত থাকতে বিহারে আশ্রয় নেয়া একজন নারী পুরুষের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।" তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাদের রক্ষণাবেক্ষণের। আমি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের বিহার এলাকায় বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাম গুল মোহাম্মদ ও জনাম শফিকউদ্দিন আহম্মদ আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন।' তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে অসহায় জনগোষ্ঠীর অন্যতম সহায়ক শক্তি ছিলেন। বলা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যতিক্রমী এক মুক্তিযোদ্ধা। বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী তিনি। এছাড়া স্বাধীনতা উত্তর দেশ গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করে তাঁর সেই অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর জীবনাদর্শ সমাজে বিকশিত হোক এবং প্রত্যাশা করি, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।[১৭]

মুক্তিসংগ্রামে শহীদ জিনানন্দ ভিক্ষু এর আত্মত্যাগ

ভিক্ষু জিনানন্দ ছিলেন সমাজসেবক, ত্রিপিটক বিশারদ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু। জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ছিলেন সংসারবিমুখ। মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বৌদ্ধ বিহারে থেকে বৌদ্ধ ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দিতেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জিনানন্দ গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের তখন পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে বৌদ্ধদের বাঁচানোর জন্য চট্টগ্রামে একটি অফিস প্রতিষ্টা করেন। এই অফিসের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন ভিক্ষু জিনানন্দ। এখান থেকে বৌদ্ধদের পরিচয়পত্র দেওয়া হত, সেটা দেখলে পাকিস্তানি সেনারা পরিচয়পত্রদারীকে হত্যা করত না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত অনেক গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার সাথে ভিক্ষু জিনানন্দের যোগাযোগ ছিল। তিনি সেই সব যোদ্ধার অনেককে বৌদ্ধ বিহারে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর গাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য টাকাপয়সা ও সাহায্য দ্রব্যাদিবহন করা ছাড়া অস্ত্রও বহন করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জিনানন্দের এই তৎপরতার কথা একসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশীয় দোসর রাজাকারদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। ১৩ ডিসেম্বর রাজাকাররা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর কোথাও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ শহীদ হন।[১৮]

১৯৭১ সালের দুঃসহ দিনে বৌদ্ধদের রক্ষার জন্য পাশে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের। তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ ও অন্যান্য কার্যক্রম চালানোর জন্য চট্টগ্রাম শহরে একটি অফিস স্থপন করেন। ভিক্ষু জিনানন্দ ছিলেন সে অফিসের কর্মাধ্যক্ষ। সে সময় বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ বৌদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য পরিচিতিপত্র বিলি করেছিলেন বৌদ্ধদের মাঝে। পরিচিতিপত্র দেখালে পাকসেনা এবং তাদের দোসররা বৌদ্ধদের নির্যাতন করত না। ভিক্ষু জিনানন্দের সাথে সর্ম্পক ছিল মুক্তিপাগল দামাল ছেলেরা। তিনি এ রকম অনেক পরিচিতিপত্র বৌদ্ধ ছাড়াও অনেক যুককে দিয়েছিলেন। ঐ পরিচিতিপত্র নিয়ে অনেকে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় ও প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে দেশে এসে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। অধিকন্তু তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরও পরিচিতিপত্র দিয়েছিলেন, যাতে তারা অবাধে চলাফেরা করতে পেরেছিল। অসীম সাহজের অধিকারী এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছিলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর গোপন তৎপরতার কথা ফাঁস হয়ে যায়। তখন তিনি পটিয়া থানার পাঁচরিয়া গ্রামের বৌদ্ধবিহারে অবস্থান করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দুদিন পূর্বে রাজাকাররা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিনি নিখোঁজ হন ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না।[১৯]

উপসংঘরাজ পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনন্য সংঘমনীষা

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির মহত্তম অর্জন। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির শ্রেষ্ঠ গৌরবগাঁথা। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্য দশ দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে আলাদা। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনমানুষ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেননি সত্য, কিন্তু কেউ বসে থাকেননি। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউবা কলম হাতে, কেউবা মেধা মননশীলতা খাটিয়ে, কেউবা গানে গানে, কেউ শিল্পীর তুলির আঁচড়ে বাংলাদেশের জন্য

সংগ্রাম করেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতিসত্তা হিসেবে বৌদ্ধরা অতি প্রাচীন। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে বৌদ্ধদের অসামান্য অবদান রয়েছে। এদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে বৌদ্ধদের গৌরবময় অবদান লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার পক্ষে অংশগ্রহণ আমাদের জাতিকে গর্বিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিদের জন্য স্মরণীয় এবং ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত একটা অধ্যায়। লাখো শহীদের আত্মত্যাগ ও লাখো মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হয় সবুজের মাঝে রক্ত সূর্যখচিত একটি পতাকা, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব, আমাদের প্রেরণার উৎস। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছেন। যাদের জন্য আমরা গর্বিত এবং অনুপ্রাণিত।[২০]

রক্তাক্ত সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসের সাথে এদেশের বৌদ্ধরাও জড়িত। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রেখে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায় পাক আমলে এদেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে জাতির জনক বাংলা মায়ের সূর্যসন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ ভাষণ প্রদান করেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' বজ্রকণ্ঠে আহ্বান করার পর দেশে শুরু হয়ে যায় মুক্তির সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে পরাধীন জাতি থেকে স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের মাথা উঁচু করে পরিচয় দেওয়ার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলার দামাল ছেলে, মেয়ে, যুব, বৃদ্ধা প্রমূখ আপামর জনতা। পাকিস্তানের শাসকদের নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বাঙালিদের উপর অমানবিক নির্যাতন, অত্যাচার, বাড়ি-ঘর-জ্বালাও-পোড়াও, ধর্ষণসহ নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। সেই সময় অনেক মুসলিম, হিন্দু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন প্রায় বৌদ্ধ পাড়ায় ও বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন জীবন বাঁচানোর তাগিদে। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্মিলিতভাবে আশ্রিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে আহার ও নিরাপত্তার ব্যাপারে যতটুকু সম্ভব আন্তরিকভাবে সহায়তা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা জাতিকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে। তখন আত্মত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু সত্যপ্রিয় মহাথের বিহারে এবং গ্রামে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীদের জীবন বাঁচানোর জন্য যা সহায়তা করা প্রয়োজন তিনি তা জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের সাথে মোকাবেলা করে রক্ষা করেছিলেন, একজন আদর্শ দেশপ্রেমী বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাহস ও সততার ফল কতটুকু সেই সময়ে বাস্তবে না দেখলে বুঝা কঠিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি বৌদ্ধগ্রাম ও বৌদ্ধ বিহার ছিল তখনকার সময়ে সেবা ও নিরাপত্তা দানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানুষের অপ্রমেয় মৈত্রীগুণ মহাশত্রুকেও পরাভূত করতে পারে এটাই জ্বলন্ত উদাহরণ। মানবতাবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু সত্যপ্রিয় মহাথের গ্রামবাসীদের থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এবং নিজের কাছে যা ছিল তা দিয়ে শরণার্থীদের আহারদান ও নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। জাতির সেই ক্রান্তিলগ্নে পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় সকলকে আশির্বাদ ও মৈত্রী দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। সেইদিন যাদের প্রাণে রক্ষা করেছিলেন তাদের অনেকে আমৃত্যু পূজনীয় সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয়ের গুণ স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তাঁর মৃত্যুর কথা শুনে অনেকে ছুটে এসে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। তারা বলেন, শ্রদ্ধেয় আত্মত্যাগী মহান সংঘমনীষা সত্যপ্রিয় মহাথের ১৯৭১ সালে আমাদেরকে নিজের জীবন দিয়ে প্রাণে রক্ষা করেছিলেন তাঁর ঋণ আমরা জীবনে শোধ করতে পারবো না। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা এ মহান ত্যাগদীপ্ত মহাপুরুষকে রাষ্ট্রীয় একুশে পদকে ভূষিত করে জাতীয়ভাবে সম্মানিত করেছেন। এটা তাঁর সুদীর্ঘ পবিত্র ব্রহ্মচর্য জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৯৭১ সালে কক্সবাজারের এক জনসভায় যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসেছিলেন তখন পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিমসহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের বঙ্গবন্ধুর জনসভায় অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে অনেক নেতৃবৃন্দ, সমাজপতি, বিত্তবান, শক্তিধর ব্যক্তি জীবন বাঁচাতে পরিবার পরিজন নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মায়ানমারের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। কিন্তু মায়ানমার সরকার কর্তৃক সম্মানের সাথে থাকার আমন্ত্রণ পাওয়ার পরও দেশের সংকটময় মুহূর্তে দেশ ত্যাগ করেননি পরম পূজনীয় সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী বাঙালির উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালালে বিপদাপন্ন রামুর বৌদ্ধ, মুসলিম, হিন্দু জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে রামু সীমা বিহারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। খবর পেয়ে পাকিস্তানীরা সেই সময় বিহারে আসলে পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের সাহসের সাথে তাদের সম্মুখীন হয়ে বিহারে আশ্রয় নেওয়া সবাইকে সুরক্ষা করেন এবং জীবন রক্ষা করেন। সে সময় অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত প্রতীক পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয়ের কাছে কোন ধর্মে বিশ্বাসী সেটা তাঁর কাছে মূখ্য বিষয় ছিল না। আহার, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা দিয়ে সবাইকে আগলে রাখাই ছিল তাঁর কাছে বড় দায়িত্ব। এই মহান সাংঘিক ব্যক্তিত্ব সর্বদা লালন করতেন 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' বুদ্ধের মহাবাণী।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ এবং তৎপরবর্তীকালে পাকিস্তানী সেনা ও তাদের দোসরদের জঘন্য আক্রমণ থেকে বৌদ্ধরা রেহাই পায়নি। লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নি সংযোগের হাত থেকে বৌদ্ধরা রক্ষা পায়নি। বৌদ্ধ গ্রাম ও বৌদ্ধ বিহার আক্রান্ত হয়েছে, বুদ্ধমূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং অনেক বৌদ্ধ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ সংঘরাজ অভয়তিষ্য

মহাথেরও এ নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি। অনেক বৌদ্ধ বিহার এবং বৌদ্ধ গ্রাম লুণ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন স্থানে মেয়েদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। এ সময় কেউ কেউ প্রাণ ভয়ে মায়ানমার ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এর মাঝেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বৌদ্ধরা গ্রামে গ্রামে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসে পাকিস্তানি বাহিনী রামুর একাধিক মহাজন বাড়ি, কক্সবাজার শহরের প্রখ্যাত হেডমাস্টার অমিয় কুমার বড়ুয়া, অমিতশ্রী বড়ুয়া, সঞ্জয় বড়ুয়াদের বাড়ি এবং রত্না পালং এর আম্বিকা চরণ বড়ুয়া, সাবেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ধনঞ্জয় বড়ুয়ার বাড়ি, অনিন্দ কুমার বড়ুয়ার বাড়ি এবং ভালুকিয়া পালং এর যোগেন্দ্র সিকদারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন। কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার দীপক বড়ুয়া প্রথম দিকে পাকসেনাদের গুলিতে নিহত হন। তিনি একাত্তরের চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ বলে জানা যায়। উখিয়া থানার রুমখা পালং গ্রামের মনীন্দ্র বড়ুয়া (ভট্ট মহাজন) বড়ুয়াকে হাত-পা বেঁধে পাকবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেন। কক্সবাজার জেলার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল হক, মোস্তাক আহমেদ, এডভোকেট আহমেদ হোসেন, শমসের আলম চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সংসদ সদস্য সাবেক ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী, সাবেক ইপিআর সদস্য, পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও স্থানীয় যুবকদের সাথে বৌদ্ধরা পার্শ্ববর্তী মায়ানমারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্টির স্বাধীনতা স্বজাত্যবোধের চিরায়ত ধর্মীয় ধারায় কালে কালে প্রগতিশীল আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান ছিল অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশে-বিদেশে নানাভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী কর্মধারার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এদের মধ্যে সংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাথের, পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের, সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাথের, শান্তপদ মহাথের, ধর্মবিরিয় মহাথের, ড. শাসনরক্ষিত মহাথের, সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাথের, মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, উপ-সংঘরাজ ধর্মপ্রিয় মহাথের, সংঘরক্ষিত ভিক্ষু ও শহীদ জিনানন্দ ভিক্ষু, বঙ্গীশ ভিক্ষুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত সাগর কুন্তলা, পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলাধীন ইতিহাস খ্যাত রম্যভূমি রামু'র প্রাণকেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম মেরংলোয়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১০ই জুন পিতা হরকুমার বড়ুয়া ও মাতা প্রেমময়ী বড়ুয়া'র কোল আলোকিত করে জন্ম নিয়েছিলেন বিধুভূষণ বড়ুয়া নামের এক ফুটফুটে পুণ্যবান শিশু সন্তান। চুম্বকের একটি নিজস্ব ধর্ম আছে। লোহাকে আকর্ষণ করাই হচ্ছে চুম্বকের ধর্মতা। অনুরূপভাবে ধর্ম, ধর্মচারীকে আকর্ষণ করে। একইক্রমে ধর্মচারী ধর্মকে আকর্ষণ করে থাকে। সর্বদা ভাবুক মনে যৌবনের উন্মত্ততাকে দমন করেই তিনি বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাথের'র নিকট কিশোর বিধভূষণ বড়ুয়া শ্রামণ্যধর্মে অর্থাৎ প্রব্রজ্যা লাভ করেন। বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাথের'র বিনয় গাঢ়বতা সহসাই শ্রামণ সত্যপ্রিয়কে আকৃষ্ট করত। শ্রামণ সত্যপ্রিয় ধর্ম-বিনয়ে প্রগাঢ় আচার নিষ্ঠ ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হয়ে আচার্য ষষ্ঠ সংগীতিকারক বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাথের'র নিকট পবিত্র উপসম্পাদা লাভ করেন।

পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের ছোটকাল থেকে মাতা-পিতা, গুরু-আচার্যের একান্ত বাধ্যগত ও অত্যন্ত অনুগত প্রাণ ছিল। গুরুর সেবায় তিনি শ্রামণ কাল অবধি নিবেদিত ছিলেন। এতে তিনি 'ধৈর্য্যই ধর্ম-সেবাই আদর্শ'- এ মনোভাব নিয়ে গুরু সেবাকে ব্রত মনে করতেন। এতে তিনি আনন্দ পেতেন। ১৯৫১ সালে গুরু আর্যবংশ মহাথের মহোদয়ের সাথে উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত ভালুকিয়া বৈজয়ন্ত বিবেকারাম বিহারের অধ্যক্ষ রূপে দায়িত্ব নেন। তখন থেকেই গুরু সান্নিধ্য থেকে ধর্ম-বিনয় ও গুরুর সেবা কাজের জন্য বৈজয়ন্ত বিবেকারাম বিহারে প্রথম বর্ষাবাস যাপন করেন। পরে ১৯৫২ সালে মির্জাপুর পালি কলেজে পালি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। মিয়ানমার থেকে ফিরেই দীর্ঘকাল অবধি নিজ জন্মস্থানে রামু সীমা বিহারে অবস্থান করে সদ্ধর্মের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে গেছেন।

ধর্ম-বিনয় অধ্যয়নের জন্য ১৯৫৪ সালে তিনি মায়ানমার তথা ব্রহ্মদেশ গমন করেন। ব্রহ্মদেশে গিয়েই রেঙ্গুনের গবায়ে (বিশ্বশান্তি স্থানের) যেখানে ষষ্ঠ সঙ্গায়ন অনুষ্ঠিত হয় সেই জম্বুদ্বীপ মহাবিহারে অবস্থান করেন এবং ধর্মদূত পালি কলেজে ভর্তি হন। সেখানেই দীর্ঘ বছর ধর্ম-বিনয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রেঙ্গুণে অবস্থানকালীন পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের ষষ্ঠ সঙ্গায়নে অংশগ্রহণ করেন। পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের ঐতিহ্যবাহী সাংঘিক সংগঠন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ১৩ই নভেম্বর ২০০৬ সালে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজ, সদ্ধর্ম ও সংঘ সমাজের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের এর অবদান ছিল চোখে পড়ার মতো। চীনা বৌদ্ধদের আমন্ত্রণে তিনি সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেন। বিশ্ব মানবতাবাদী সংগঠন রিসসো-কোসেই-কাই জাপানের আমন্ত্রণে পৃথিবীর অনন্য সৌন্দর্যময় দেশ জাপানে সফর করেন। ভারতের মহাবোধি সোসাইটি ২৫৫০ বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর সঙ্গী হয়ে গমন করেন। জেনেভায় ইউপিআর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৪ই মার্চ ২০০৩ ইংরেজি ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিনে পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয়কে মায়ানমার সরকার এক রাজকীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যদায় 'অগ্গমহাসদ্ধম্মজোতিকাধ্বজ' উপাধি প্রদান করেন। এছাড়া রামুর আর্যবংশ ভিক্ষু সংস্থা 'পণ্ডিত' উপাধি প্রদান করেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ 'শান্তি পদকে' ভূষিত করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সামাজিক আন্দোলনে গৌরবনীয় ভূমিকা রাখায় বিনয়শীল পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথেরকে রাষ্ট্রীয় পদক একুশে পদকে ভূষিত করেন।

পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয়ের পূতপবিত্র সাংঘিক জীবন ধারণের পাশাপাশি বুদ্ধশাসনের স্থিতি ও রক্ষার জন্য যোগ্য উত্তরসূরী তথা শিষ্য গঠন করেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে সদ্ধর্মের কল্যাণে আত্মনিবেদিত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আছেন- ভদন্ত জিনরত্ন মহাথের (প্রয়াত), ভদন্ত ধর্মরত্ন মহাথের (ভারত), ভদন্ত এসএম সংঘরত্ন মহাথের, ভদন্ত প্রিয়রত্ন মহাথের, ভদন্ত সুনন্দপ্রিয় মহাথের (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন), ভদন্ত জ্ঞানরত্ন মহাথের, ভদন্ত প্রজ্ঞাবোধি মহাথের, ভদন্ত করুণাশ্রী থের, ভদন্ত গৌতমরত্ন থের (ভারত), ভদন্ত কীর্তিরত্ন থের (কলকাতা), ভদন্ত শীলরত্ন থের, ভদন্ত শীলপ্রিয় থের (একান্ত সেবক), ভদন্ত শাসনপ্রিয় থের, ভদন্ত শরণপ্রিয় থের, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু (সভাপতি, কক্সবাজার জেলা বৌদ্ধ সুরক্ষা পরিষদ) প্রমূখ। পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় এক বিশাল বিস্তৃত সাংঘিক সংঘমনীষার নাম। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মূল্যায়ন বহুমুখী। তাকে এক বিশেষ অভিধায় বিভূষিত করা অত্যন্ত শক্ত। তবে আমার এ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন কোন মতেই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়, সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ মাত্র। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ইতিহাস যেন এক মহিমান্বিত বিনয়শীল সাংঘিক জীবনের উদাহরণ। তাঁর ব্যাপিত জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, চর্চা ও মননশীলতাকে অভিন্ন সাত্বিক সত্তা। পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় এক মহত্তম জীবনের এক সুবর্ণ রেখা। বাংলার থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম বিকাশের সূচনালগ্ন থেকে রেনেসাঁ উত্তর নবজাগরণের মূল ভিত্তি হিসেবে বাঙালি বৌদ্ধদের পথপ্রদর্শক পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের একটি অনন্য উদাহরণ হয়ে চির জাগরুক থাকবে ভক্তমন্ডলীর মন মন্দিরে।

রামু কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ও একুশে পদক প্রাপ্ত পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় বিগত ৩রা অক্টোবর ২০১৯ দিবাগত রাত পৌনে ১ টায় বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাপ্রয়াণ করেন। ৯ই অক্টোবর, ২০১৯ কেন্দ্রীয় সীমা বিহার প্রাঙ্গণে প্রয়াত ভন্তের পেটিকাবদ্ধ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর ঊশৈসিং এমপি বলেন, 'পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় শুধু ভগবান বুদ্ধের বাণী দিয়ে মানুষের চিত্তকে শুদ্ধ করেননি, তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে চীনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, সব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি মমতাবোধ দেখিয়ে মানুষকে রক্ষা করেছেন। তিনি জীবনে মানুষের জন্য যা করেছেন, তাঁর কর্মের কারণে তাঁর প্রতি আজ সর্বস্তরের মানুষের এত ভালোবাসা'। প্রয়াত পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয়ের প্রতি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি পৃথক পৃথকভাবে শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসানের পর ব্যাপক শানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ এক নতুন বাঙালি জাতি জন্মলাভ করল। এখানে ধর্ম কিংবা বর্ণ জাতির কোন ভিত্তি নেই। আজকের ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের নতুন অন্বেষায় বাঙালি তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করেছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানের সম্মিলিত স্রোত ধারায়। বাংলার পলি মাটিতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন ঘটেছে এবং এর মাধ্যমে সমন্বয় ও সঙ্গীকরণের নতুন ভাবধারা রচিত হয়েছে।[২১]

পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে- 'বিনয নাম বুদ্ধসাসনস্স আয়ু, বিনযং ঠিতে বুদ্ধসাসনং ঠিতং হোতি', অর্থাৎ বিনয় হল বুদ্ধশাসনের আয়ু, বিনয়ের ওপর বুদ্ধশাসন স্থিত। এই বিনয়ধর্ম যতদিন সমাজ সদ্ধর্মে অক্ষুণ্নভাবে প্রতিপালিত হবে ততদিন বুদ্ধশাসনের পরিহানী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাস্থবির মহোদয় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের গর্বিত একজন বিনয়শীল আদর্শ সাংঘিক মনীষা ছিলেন। তাঁরই আশির্বাদপুষ্ট বিনয়শীল সত্যপ্রিয় মহাথের তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে অন্যতম সাংঘিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গুরুদেব যেমন বুদ্ধের বিনয় ধর্মের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র নীতি-নিয়মগুলোকে গুরুত্ব দিতেন তেমনি তাঁর প্রিয় শিষ্য সত্যপ্রিয় মহাথেরও নিখুঁত ব্রহ্মচর্য পালনের ক্ষেত্রে বিনয়শীল জীবন প্রতিপালনে শুধু আন্তরিক ছিলেন না, একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ বিনয়শীল ভিক্ষু হিসেবেও বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ গগণে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমার শ্রামণ্য জীবন থেকে শুরু করে ভিক্ষু জীবনযাপন করতে গিয়ে বিনয়শীল সত্যপ্রিয় মহাথের'র দৈনন্দিন ব্রহ্মচর্য জীবনের নিখুঁত ব্রত পালনের আদর্শ দেখে আমি শুধু অভিভূত হইনি বর্তমান সময়ে তাঁর মতো বিনয়ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে অতি উজ্জ্বল সাংঘিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বর্তমান সময়ে বিরল বললেও বেশি বলা হবে না। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ গগনের প্রথম সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির বুদ্ধের মৌলিক থেরবাদী আদর্শকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়। একদিকে তাঁর ত্রিপিটক শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য যেমন ছিল তেমনি বুদ্ধের বিনয়ের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল সাংঘিক সমাজের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বিশ্বায়ণের যুগসন্ধিক্ষণে বিনয়শীল সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় শাসন সদ্ধর্মের উন্নতি কল্পে তাঁর নীতি নিয়ম ছিল সকলের কাছে আকর্ষণীয় এবং অনুকরণীয়। তাঁর সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য জীবনে বুদ্ধের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ রক্ষায়ও তাঁর যে আন্তরিকতা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত দুর্লভ। তিনি বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় বুদ্ধের অমৃতময় বাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়িছেন শুধু তা নয়, ভারত ও বহির্বিশ্বের বৌদ্ধ দেশসমূহে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে তাঁর বিনয়শীলব্রত পালনের দৃষ্টান্ত দেখে অনেকে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে বহুভাবে তাঁকে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দিতে দেখা যায়। তাই বুদ্ধের পরিভাষায় বলা যায়, আত্মত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি বা যারা কায়দ্বার সংযত, বাক্যদ্বার সংযত ও মনোদ্বার সংযতসহ

ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করার চেতনায় সদা সর্বদা সচেতন থাকেন তাকে বলা হয় আদর্শ ভিক্ষু। যার ধ্যান-সমাধি চর্চার ক্ষেত্রেও দমিত চিত্ত, শান্ত চিত্ত ও সমাহিত চিত্ত আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার অনুধ্যান ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বিনয়শীল সত্যপ্রিয় মহাথের মহোদয় সে আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত ছিলেন না। তিনি দৈনন্দিন জীবন আচরণের মধ্যে পরিষ্কার পরিছন্ন জীবন গঠনে খুবই সচেতন শুধু ছিলেন না তা বাস্তবায়নে খুবই আন্তরিক ছিলেন। এটাও তাঁর সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য জীবনের বিনয়শীলতার পরিচয় মেলে ধরে। তিনি কথা-বার্তা আহার-বিহার এমনকি গৈরিকবসন পরিধান করার ক্ষেত্রেও পরিপাটি ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে উপসংঘরাজ ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথের এর অবদান

পৃথিবীর বুকে প্রতিদিন কত মানব শিশুর আগমন হয়। আবার সকলে হারিয়েও যায়। এই হারিয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষই আছে যাঁরা তাদের কীর্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে স্মরণীয় হয়ে থাকে। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, মানব জীবন দুর্লভ। কিন্তু এই দুর্লভ মানব জীবন পেয়ে নিঃশব্দ নীরবে, সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে যায় অধিকাংশ মানুষ। যদিও এভাবে হারিয়ে যাওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মূলত পার্থক্য এখানেই। প্রাণীরা জন্ম নেয়, কিছুদিন বেঁচে থাকে তারপর মরে যায়। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করলে তার জীবদ্দশায় অনেক কিছু করতে পারে। মানুষের জন্য, সমাজ-সদ্ধর্মের সমৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর কল্যাণে। এই সুযোগকে অনেকে কাজে লাগায়, অনেকে লাগায় না। সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র নিজের চারপাশে তাকালেই এই সত্য প্রকট হয়ে উঠে। যাঁরা মানব জীবনকে কাজে লাগায় তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকেন তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষের মনে। তেমনই একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী, সদ্ধর্মের সূর্য সন্তান, থেরবাদ বিকশিত হবার প্রাণকেন্দ্র মহানন্দ সংঘরাজ বিহার এর বিহারাধ্যক্ষ মূল থেরবাদ আদর্শের প্রতিভূ বিচিত্র ধর্মকথিক, শাসনস্তম্ভ উপসংঘরাজ পরমারাধ্য ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথের।প্রাজ্ঞ এই মহামনীষীর জীবনচার খুবই ঋদ্ধ। তাঁর কর্মময় জীবনের ব্যপ্তি এতই বিস্তৃত যে, ছোট পরিসরে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয় বিশেষ করে আমার মতো অধম শিষ্যের মাধ্যমে। এ জন্য প্রয়োজন রয়েছে অভিজ্ঞ কোন জীবনী রচয়িতার, প্রয়োজন রয়েছে বর্ধিত কলেবরে কোন গ্রন্থ রচনার। এখানে শুধুমাত্র সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্যাসটুকু লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তবে এটা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাশা করা যায়, হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন তেমনই মহতী উদ্যেগ গ্রহণ করা হবে। ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথেরো সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে চট্টগ্রাম জেলার উত্তরাঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ বৌদ্ধ জনপদের দিকে। হাটহাজারী উপজেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি সদ্ধর্ম গ্রাম মির্জাপুর। এই গ্রামেই সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক দূযোধন বড়ুয়া ও ধার্মিক উপাসিকা শান্তিবালা বড়ুয়ার ঘর আলোকিত করে ১৯৩৩ সালে ৭ ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এক পবিত্র মানব শিশু, যাঁর গৃহী নাম অমলেন্দু বড়ুয়া। তিনিই সকলের শ্রদ্ধাভাজন উপসংঘরাজ ধর্মপ্রিয় মহাথের। চার ভাই এবং এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। উনার অন্যান্য ভাই-বোনের নাম হলো- হেমেন্দু বড়ুয়া, অর্দ্ধেন্দু বড়ুয়া, জীবদাশ বড়ুয়া এবং বোন খুকিবালা বড়ুয়া। পূজনীয় ভন্তের বংশলতিকায় দেখা যায় উনার ঠাকুরদাদার নাম ছিল গোবিন্দরাম বড়ুয়া এবং ঠাকুরমার নাম ছিল মালঞ্চ বড়ুয়া। গোবিন্দরাম বড়ুয়া ও মালঞ্চ বড়ুয়ার চার পুত্র। পুত্র সন্তানেরা হলেন- নবরাজ বড়ুয়া, যুবরাজ বড়ুয়া, ভূবন বড়ুয়া, দূর্যোধন বড়ুয়া। পূজনীয় ভন্তের জ্যেষ্ঠতাত নবরাজ বড়ুয়াই পরবর্তীতে ষষ্ঠ সংঘরাজ ধর্মানন্দ মহাস্থবির হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। যুবরাজ বড়ুয়া সংসারধর্ম পালন করেন। তিনি এক পুত্র এবং দুই কন্যা সন্তানের জনক হন। ভূবন বড়ুয়া অকাল প্রয়াত হন। দূর্যোধন বড়ুয়াও সংসার ধর্ম পালন করেন এবং চার পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক হন। ১৯৭১ সালে বাঙালির জীবনের এক ঐতিহাসিক সময়।[২২]

১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার পক্ষে অংশগ্রহণ আমাদের জাতিকে গর্বিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিদের জন্য স্মরণীয় এবং ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত একটা অধ্যায়। লাখো শহীদের আত্মত্যাগ ও লাখো মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হয় সবুজের মাঝে রক্ত সূর্যখচিত একটি পতাকা, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব, আমাদের প্রেরণার উৎস। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছেন। যাদের জন্য আমরা গর্বিত এবং অনুপ্রাণিত। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন। অনেক হিন্দু, মুসলমানকে প্রাণে রক্ষা করেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মানব সেবা, ধর্মপ্রচার, শিক্ষাব্রতী এবং দেশ মাতৃকার জন্য নিবেদিত প্রাণ। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় এবং দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হয়। যুদ্ধকালীন সময়েও ভন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন দূর্গত গ্রাম থেকে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের দেখাশুনা, অন্নের ব্যবস্থা, গ্রামের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কমিটি গঠন করে পাহাড়ার ব্যবস্থা, দূরাগত মুক্তিযুদ্ধাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করে অবদান রেখেছেন। মহান স্বাধিনতা যুদ্ধে ভন্তের অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।[২৩]

শহিদ উ তেজিন্দা মহাথের

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরেরা ধর্মীয় উপসনালয়ে পর্যন্ত আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ১৯৭১ সালের ৬ মে মহেশখালী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইন বৌদ্ধ বিহারে ধর্ম পিপাসুদের উদ্দেশ্যে দেশনারত অবস্থায় অতর্কিত হামলা করে হানাদার

বাহিনী। এসময় হানাদাররা বিহারের প্রধান ও অধ্যক্ষ ভিক্ষু উ তেজিন্দা মহাথেরসহ আটজনকে এবং নির্যাতন করে হত্যা করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উ আদুং মং রাখাইন, উ মাদ্রা রাখাইন, উ মংটিন রাখাইন, উযেন চা রাখাইন, উ অং টি রাখাইন, উ ঞানা রাখাইনকে বিহারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে। পাকিস্তানি হায়েনাদের কবল থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া চচা মং রাখাইন ও চিং হ্লা মং রাখাইন (বাকপ্রতিবন্ধি, বোবা) আজো ঠাকুরতলায় রাখাইন পাড়ায় বসবাস করছে। একই দিন মহেশখালী লামার পাড়ায় আক্রমণ চালিয়ে বৌদ্ধ বিহারও তিন শিষ্যকে আগুনে পুড়িয়ে মারে। এ সর্ম্পকে রাখাইন গবেষক, মং ছেন মংচীন বলেন, ঝড়ে পড়ল কয়েকটি তাজা প্রাণ (গোলাম মোর্তজা সম্পাদিত, ভুলি নাই : স্বাধীনতার পঁচিশ বছর স্বাধীনতা অনন্তকালের, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭) নামক প্রবন্ধে লিখেন, মহেশখালী লামার পাড়া বৌদ্ধ বিহারে আক্রমণ চালিয়ে উ ঞানা, উ যেন চা এবং নাম না জানা এক শিষ্যকে বৌদ্ধ বিহারে প্রাত:রাশ রন্ধনরত অবস্থায় তিনজন কুখ্যাত পাকিস্তানি সৈনিক বিহারের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে বুদ্ধের মূর্তি লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ে। যার ফলে মূর্তির বামবাহু আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অতপর সৈনিকেরা ভিক্ষুদেরকে নিচে নেমে আসার আদেশ দেয় এবং ঐ রান্নাঘরে ভেতরে জোরপূর্বক আটক রেখে বাইরে তালাবদ্ধ করা হয়। এরপর বর্বর সৈনিকেরা বিহারের নিকটস্থ খড়ের চালা সংগ্রহ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবাবে নির্মম শিকার হয়ে আগুনে পুড়ে জীবন দিতে হল নিরাপরাধ তিন বুদ্ধ শিষ্যকে।[২৪]

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহারের অবস্থা

ইতিহাস মতে প্রায় চারশত বছর এই ভূখন্ড বৌদ্ধ শাসনাধীন ছিল।খ্রিষ্ঠীয় ৭৫০-১১২০ পাল রাজাদের শাসনামল, প্রকৃত অর্থে এটিই বাংলার বৌদ্ধ যুগ। এ সময়ে বাংলায় যে বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল সেরূপ বড় আকারের বৌদ্ধ বিহার তৎপরবর্তীকালে কোথাও আর গড়ে ওঠেনি।এই বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে নালন্দা মহাবিহার, বিক্রমশীল মহাবিহার, শালবন মহাবিহার, সোমপুরী মহাবিহার উল্লেখযোগ্য।বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালের বেশিরভাগ বৌদ্ধ বিহারের আকৃতি ও পরিসর ছিল খুবই ক্ষুদ্র আঙ্গিকের।একটি প্রার্থনার হল ঘর ও আবাসিক ভিক্ষুদের থাকার জন্য কয়েকটি কক্ষ।এই নিয়েই ছিল বৌদ্ধ বিহার।আবার অনেক বৌদ্ধ বিহারের বড় হল ঘরও ছিল না।কিন্তু যেটুকু ভিটে বা বিহারের ভূমি ছিল তাতে নির্জন ও নীরবতাময় একটি পরিবেশ ছিল।

স্বাধীনতা পূর্বকালে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে সতশ'র মতো বৌদ্ধ বিহার ছিল।এগুলোর মধ্যে অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল যেখানে শুধুমাত্র একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকতেন।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই সমস্ত নির্জন পরিবেশের বৌদ্ধ বিহারগুলোর কোনটি ছিল শরণার্থী ক্যাম্প, কোনটি ছিল চিকিৎসা ক্যাম্প, আবার কোনটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় কেন্দ্র।যে সমস্ত গ্রামে উপযুক্ত যাতায়ত ব্যবস্থা ছিল না সেই সমস্ত গ্রামের বৌদ্ধ বিহার গুলোতেই এরূপ কর্মকাণ্ড বেশি পরিচালিত হতো। এর মধ্যে চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত হালদা নদী সংলগ্ন আবুরখীল গ্রাম, পাহাড় বেষ্টিত পাহাড়তী মহামুণি গ্রাম,হোয়ারাপারা গ্রাম,বীনাজুরি গ্রাম,আধারমানিক গ্রাম,ফতেনগর গ্রাম,হিঙ্গলা গ্রাম,তদানীন্তন পটিয়া থানার অন্তগত গ্রামগুলোর মধ্যে কর্তালা,বেলখাইন,তালসরা,জোয়ারা ও কানাইমাধারী গ্রাম এবং রাঙ্গুনিয়া ইছামতি নদী সংলগ্ন বৌদ্ধ গ্রামগুলোর সাথে পাহাড় ঘেরা পদুয়া,রাজস্থলি,বাঙালখালী গ্রাম (বর্তমান ইউনিয়ন) এবং রামুর রামকুট ও কক্সবাজারের অগ্গমেধা বৌদ্ধ বিহার ও বিহার সংলগ্ন বৌদ্ধপল্লীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এসব বৌদ্ধ জনগন সমৃদ্ধ এলাকার বিহারগুলো যোগাযোগের সুবিধার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেমন আকর্ষণীয় ছিল তেমনি ঐতিহ্যবাহী মূল্যবান বুদ্ধমূতি থাকার কারনে স্থানীয় সন্ত্রাসী রাজাকারদেরও দৃষ্টি ছিল এগুলোরদিকে।[২৫]

উপসংহার

আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির স্বাধীনতা স্বজাত্যবোধের চিরায়ত ধর্মীয় ধারায় কালে কালে প্রগতিশীল আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান ছিল অপরিসীম। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। স্বেচ্চাচারী শাসনের অবসানের পর ব্যাপক শানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ এক নতুন বাঙালি জাতি জন্মলাভ করল। এখানে ধর্ম কিংবা বর্ণ জাতির কোন ভিত্তি নেই। আজকের ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের নূতন অন্বেষায় বাঙালি তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে আবিস্কার করেছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টানের সম্মিলিত স্রোত ধারায়। বাংলার পলি মাটিতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির উত্থান পতন ঘটেছে এবং এর মাধ্যমে সমন্বয় ও সঙ্গীকরণের নতুন ভাবধারা রচিত হয়েছে। আজকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ঘাতকের অস্ত্রে শহীদ হওয়া লাখ লাখ বাঙালিকে অভিন্দন জ্ঞাপন করছি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। এর সাথে ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল যুবক মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে শহীদ হয়েছেন। পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, বহির্বিশ্বের বৌদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ হতে সমর্থন আদায় ও বাংলাদেশের অবস্থান সর্ম্পকে জনমত প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারি সকল বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের যথার্থ মূল্যায়ণ করা বর্তমান সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর

স্মৃতিকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারের সহায়তায় একটি পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল স্মৃতি যাদুঘর নির্মাণ সময়ের দাবি। এছাড়া সকল বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার তালিকা, স্মীকৃতি প্রদান মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য সহায়তা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে বহির্বিশ্বে জ্যোতিঃপাল মহাথেরর অবদান বাঙালি বৌদ্ধদের কাছে নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করে বিপুল অবদান রাখতে সক্ষম হন। বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস যতদিন থাকবে ততদিন স্বর্ণক্ষরে পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরর অবদান লিপিবদ্ধ থাকবে। আমাদের চিন্তা চেতনা যেমন বাঙালিদের প্রগাঢ় অনুভূতিতে লালিত হবে তেমনি সংস্কারমুক্ত পরিবেশে স্বাধীনতার যে আলো আমাদের দুয়ারে উদ্ভাসিত সে আলোর প্রেরণায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় আরো নতুন ভাবে ভবিষ্যতের দিকে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকাঃ

১. প্রণব কুমার বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৭
২. বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৭৬
৩. ড. জগন্নাথ বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের অবদান : চট্টগ্রাম অঞ্চল, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা. ২০১৬, পৃ. ১৪১-১৪৪
৪. পূর্বোক্ত, মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের অবদান : চট্টগ্রাম অঞ্চল, পৃ. ১২৬-১২৭
৫. পূর্বোক্ত, মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধদের অবদান : চট্টগ্রাম অঞ্চল, পৃ. ১৩৭
৬. পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭, প্রথম সংস্করণে লেখকের বক্তব্য, পৃ. ৪-৫
৭. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে, জ্যোতি:পাল মহাথের, পরিচিতি প্রসঙ্গ, সদস্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ, ঢাকা, ৫-৭-১৯৭৬, পৃ. ৩
৮. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ১১
৯. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ১৩
১০. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম, পৃ. ১৫
১১. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম, বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের মাসিক পত্রিকা, সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২৫১৪, বুদ্ধাব্দ, ১৯৭১, পৃ. ৪৫
১২. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম পৃ. ৪৬-৪৭
১৩. *Bangladesh in Liberation Struggle, Ven. Jyotipal Mahathera,* translated by Jewel Barua, Sougata Prakashan, Dhaka, 2016, P. 59-60
১৪. ।bid, *Bangladesh in Liberation Struggle,* P. 63
১৫. একুশে পদক প্রাপ্ত মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, প্রণব রাজ বড়ুয়া, ত্রৈমাসিক কৃষ্টি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, পৃ. ৪৫-৪৭
১৬. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, আত্মঅন্বেষা : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭
১৭.ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ১ম খন্ড, শুদ্ধানন্দ মহাথের, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৮৬-৮৭
১৮. দৈনিক প্রথম আলো, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নন্দিত নাম, শহীদ জিনানন্দ ভিক্ষু, ২১ এপ্রিল, ২০১৫, পৃ. প্রথম পাতা
১৯. স্মৃতি ১৯৭১, দ্বাদশ খন্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সম্পাদনা-রশীদ হায়দার
২০. আর্যসত্য, উপসংঘরাজ সত্যপ্রিয় মহাথের জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্মারক ২০২০, সম্পাদক, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, ২৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১২৬-১২৯
২১. পূর্বোক্ত, আর্যসত্য, সম্পাদক, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, ২৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১২৬-১২৯
২২. "প্রজ্ঞা" সম্পাদক, বিভূল কুমার চৌধুরী, উপসংঘরাজ ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথের ৮৪তম জন্ম জয়ন্তী স্মারক, পৃ. ৪৪
২৩. পূর্বোক্ত, প্রজ্ঞা, পৃ. ৪৬
২৪. ড. জগন্নাথ বড়ুয়া, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ, কক্সবাজার জেলা, ইতিহাস সম্মিলনী, মার্চ ২০১৯, পৃ. ১১৩
২৫. সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের কৃতি ও কীর্তি, সম্পাদনা, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, মে ২০০৬, পৃ. ১০০-১০১

[লেখক : উৎস বড়ুয়া জয়, বিএ (অনার্স), এমএ, পিজিডি, এমফিল, প্রাবন্ধকি, গবেষক।
ইমেইল:utshabarua20@gmail.com]